আমি শুধু একা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
অটোটাইপ ১৫২ মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

শেষ রাত্রে প্রচণ্ড বোমাবাজী শুরু হলো। ও পাড়ার দেঁতো কাশীর দল এ্যাটাক করেছে। চিৎকার চেঁচামেচি। টালির ছাদ ফুটো হয়ে ভেতরে অগ্নিকাণ্ড। শিশু ডুকরে ওঠে কোনো ঘরে। গায়ে লাগল কিনা কে জানে। এমন ঘটনা নতুন না হলেও, বস্তিবাসীদের অনেকের কাছে ভীতিপ্রদ। এ-পাড়ার ছেলেরাও কতবার ও-পাড়ায় গিয়ে চড়াও হয়। আজ ওরা মওকা পেয়েছে। খবর নিয়ে নিশ্চয় জেনেছে, এরা অপ্রস্তুত। তবু এ-পাড়ার দল সাধ্যমতো লড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা চলে গেল। মালমশলা ফুরিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। চারদিকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নীরবতা ফিরে না এলেও চেঁচামেচি স্তিমিত হয়ে আসে।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করে একটু একটু করে। পাড়ার দলের মধ্যে নীচু গলায় কথাবার্তা। তাদের মা-বাবারা এতক্ষণ পরে একজন একজন করে বার হয়ে আসে ঘর থেকে।

নানান কণ্ঠে আকুল ডাক—ও শিবু—ও সুখন—মানিক। ও হারু নিউটনরে—তোদের চোট লাগে নি তো? ও ঘোত্‌না—

একজন চেঁচিয়ে ওঠে—ন্যাটা-হাবুর লাশ পড়েছে।

বস্তিবাসী একজন মহিলা বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে—এ্যাঁ। ও আমার হাবুরে—তুই এ কি করলি রে।

ন্যাটা-হাবুর লাশ পড়েছিল একটা লাইট পোস্টের নীচে। রক্তাক্ত—চেনা যায় না। হাবুর মা উন্মাদিনীর মতো ছুটে গিয়ে সেখানে আছাড় খেয়ে পড়ে। তারপর মানসিক আঘাত এবং খাদ্যাভাবের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তবে জ্ঞান হারাবার আগে হাবুর মাথা থেকে বেরিয়ে আসা ঘিলু নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল।

ধাপার দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ থেকে দক্ষিণের মৃদুমন্দ সমীরণ বইতে থাকে। লাশকে ঘিরে একদল বস্তিবাসী। তাদের এতদিনের নায়কের আজ

সুধাময়ী বলে ওঠে।

-রেশন তোলা হয় নি এখনও, চিনি, চা দুধ কিছুই নেই।

কথাটা বসন্তবাবুও জানেন। খেয়াল হয়নি। তাই ওই প্রসঙ্গ উঠতে নিজেকেই এব জন্য দায়ী আর দোষী মনে করে চুপ করে গেলেন।

সুধাময়ীও দাঁড়ালো না, ভিতরের বারান্দায় চলে এল। নিজেরই বিশ্রী লাগে।

বৃদ্ধ লোকটার আজ কোনো দাবী নেই। শুধু একটু চা চায় মাঝে মাঝে, আর নেহাত জীবন ধারনের জন্য যতটুকু না হলে নয়, ততটুকুই তার চাওয়া। কিন্তু তাও জোটে না।

সুধাময়ীরও খারাপ লাগে কথাটা ভাবতে তাই সরে আড়ালে পালিয়ে এল।

বসন্তবাবু আবার দরখাস্তখানা নিয়ে পড়েন। এছাড়া আপাততঃ করার কিছু নেই।

দরখাস্ত নয়, এ যেন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আবেদন করা। মাঝে মাঝে মনে হয় বসন্তবাবু এসব করবেন না। নিজের কাছেই কথাটা ভাবতে বিশ্রী লাগে। অতীতের ক্ষিপ্ত বাঁধ-ভাঙা যৌবন সেদিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মেতে উঠেছিল। ব্রিটিশের ইস্পাতকঠিন ভিত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত হানতে চেয়েছিল, সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল ইংরেজ শাসকের দল, দামাল ছেলেদের সেই বিদ্রোহে।

তরুণ বসন্তবাবু ছিলেন তাদেরই একজন।

সেদিন তাঁরা চেয়েছিলেন দেশ স্বাধীন হবে। 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রদীপ্ত মন্ত্রে সারা মন জেগে উঠেছিল। বৃহৎ কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন তাঁরা।

কতো বন্ধু-বান্ধব ফাঁসির মঞ্চে আত্মত্যাগ করেছিলেন, কতো জন গেছেন আন্দামানের নিভৃত নির্বাসনে। বসন্তবাবুও তিন বছর আত্মগোপন করে কাটিয়েছিলেন, তবু সংগ্রাম থামে নি। আসামের বন-পাহাড় অঞ্চলে সেবার ধরা পড়েছিলেন তার পর থেকে টানা সাত বছর জেলে।

কিন্তু কোনদিনই স্বপ্নেও দেখেন নি যে আজকের মত এই দুঃসহ দারিদ্র্য নিয়ে দিন কাটাতে হবে। অতীতের সেই আত্মত্যাগের জন্য আজকের উত্তরপুরুষদের কাছে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘোরা বেদনাদায়ক। তোমরা আমাদের মূল্য দাও সেদিনের সংগ্রামের এ কথাটা জানানোই চরম অপমানের।

বসন্তবাবু ভাবতে চান না সেই কথাগুলো। দেখেছেন আজকের তরুণ, আজকের নেতারাও তাদের কি চোখে দেখেন। সেই দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অনুকম্পা, দয়া। আজকের তরুণরা চেনে না তাদের। ঘৃণা করে।

তারা বলে—বাতিল বুড়ো-হাবড়াদের এই দয়া দেখানো কেন? বসন্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দরখাস্তখানা টেবিলে রাখা, ওতে লেখা আছে তাঁর অতীতের সংগ্রামী জীবনের কাহিনী।

কবে কি বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কতো দিন ইংরেজের জেলে ছিলেন তারই রোজমনামচা। আজ সব ব্যঙ্গে পবিণত হয়েছে।

—বাবা,

বসন্তবাবু ফিরে চাইলেন। সাবিত্রী একটা হাতল-ভাঙা কাপে চা নিয়ে ঢুকেছে। ফিকে বিবর্ণ একটু তরল পানীয়। বসন্তবাবু জানেন ওপাশের ঘরের মাসীমার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে এনেছে বোধহয়। তাই বলেন কুণ্ঠার সুরে।

—আবার চা কেন মা?

বসন্তবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। মেয়েটা যেন দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছে এই অভাবের সংসারে। সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। স্কুলের পড়াশোনায় ভালো। বড়ছেলে অমৃতও এবার বি-কম পাশ করেছে অনার্স নিয়ে।

বসন্তবাবু বুঝতে পারেন না, এত কষ্টের মধ্যে ওরা বেঁচে আছে, দিন কাটাচ্ছে কি ভাবে।

সাবিত্রী বাবাকে মনে করিয়ে দেয়।

—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। খেয়ে নাও বাবা।

কি সব ভাবছিলেন তিনি, অর্থহীন ভাবনা।

ওর কথায় বসন্তবাবুর খেয়াল হয়,—এই নিচ্ছি মা।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল, বাইরে থেকে ঢুকছে অশোক। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। পরণে পায়জামা আর পাঞ্জাবী। ওটার দিকেও অশোকের বিশেষ খেয়াল নেই, হাওয়াই চটিটা দেখে বোঝা যায় দৈনিক ওর হাঁটাচলার খতিয়ান। জীর্ণ হয়ে এসেছে সেটা।

ওর মুখ-চোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে। অশোক দাঁড়ালো একটু।

বসন্তবাবু ছোটোছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। ওর হাতে কয়েকখানা কি কাগজপত্র আর হয়তো পোস্টার, গোলমত করে গোটানো। ছেলেকে দেখে বসন্তবাবু বলেন।

—সকালবেলাতেই বের হয়েছিলি? সামনে পরীক্ষা।

অশোকের মুখে-চোখে একটা বেপরোয়া ভাব এখন হতেই ফুটে উঠেছে। বাবার কথায় অশোক জবাব দেয়। অবজ্ঞার তীক্ষ্ণতাভরা স্বরে।

—পরীক্ষা হবে কিনা ঠিকই নেই।

—তাই ঘুরে বেড়াবি? ওই সব বাজে ঝামেলায় থাকবি নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথা ভুলে?

বসন্তবাবু ছেলেকে কড়া স্বরেই ধমক দিতে চান ওর ওই ঔদ্ধত্যে।

অশোক কথার জবাব দিল না, বাবার দিকে চাইল। বাবার অক্ষম এই আস্ফালনের কোনো দামই দেয় না অশোক।

টেবিলের উপর দেখেছে ওই দরখাস্তখানা। অতীতের সেই আত্মত্যাগের মূল্য পাওয়া নিয়ে আজও দর-কষাকষি করছে ভিক্ষেপাত্র হাতে নিয়ে, এটাই অশোকের কাছে সত্যি বলে মনে হয়েছে।

অশোক জবাব দেয়।

—ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারে ঢাকা, সেখানে কোনো আলো নেই। আর কাজের কথা বলছো? ওটার ডেফিনেশন সকলের কাছে সমান নয়। তুমিও তো একদিন নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথা ভুলেই বিপ্লবের পথে নেমেছিলে। তখন তো ভাবো নি।

বসন্তবাবু চমকে ওঠেন ওর কথায়।

ছেলের দিকে চাইলেন। তার পরবর্তী জীবনের ইতিহাস নীরব যন্ত্রণায় বিবর্ণ, তাই অশোক যেন তার সব চেষ্টা আর নীতিকেই ব্যঙ্গ করছে, এই কথা ভেবে অসহায় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন।

—এসব কি বলছিল তুই?

সাবিত্রী বাবাকে দেখেছে—ও যেন অশোকের কথায় আর্তনাদ করে উঠেছে কি যন্ত্রণায়। তাই সাবিত্রী বলে।

—তুই যা না ছোড়দা। দিনরাত তোদের ওই আজে-বাজে তক্কো। তোরাই সব বুঝিস। তোদের মতই সবচেয়ে সত্য, আর সবকিছু মিথ্যে। তাই নিয়ে গলা ফাটাতে তোদের লজ্জা করে না? সবতাতেই গা জোয়ারি।

অশোক সাবিত্রীর কথায় হাসছে।

নেহাৎ যেন দয়া করেই অশোক বৃদ্ধকে নিষ্কৃতি দিয়ে ভিতরে চলে গিয়ে হাঁক পাড়ে।

—মা, ভাত হয়েছে? কুইক, এখুনি আবার বের হতে হবে। জরুরী কাজ আছে।

সুধাময়ী বলে—ফিরলি এতক্ষণে? বাড়িতে দেখা মেলে শুধু খাবার সময়, আর তো টিকি মেলে না। থাকিস কোথায়?

সুধাময়ী অশোককে সহ্য করতে পারে না।

অশোকের চড়া গলা শোনা যায়।

—কেবল কৈফিয়ত আর কৈফিয়ত, লে বাব্বাঃ! বলি ভাতটা দেবে না চলে যাবো এমনিই?

বসন্তবাবুর কানে আসছে কথাগুলো। অশোক তাকেও গ্রাহ্য করে না।

এককালে বসন্তবাবু অনেক আদর্শের স্বপ্নই দেখেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন অনেক বেশী বয়সে, সেদিন ওই আন্দোলনের ফাঁকেও সুধাময়ী এসছিল তাঁর জীবনে। অভাবটা এত নগ্ন হয়ে ফুটে ওঠে নি তখন।

দেশের বাড়িতে জমি-জারাত ছিল, চণ্ডীমণ্ডপে ধূমধাম করে দুর্গাপ্রতিমা আসতো, আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। সেদিন তাই সেই বাউণ্ডুলে মানুষটাকে সংসারী করতে চেয়েছিলেন বসন্তবাবুর মা। ভেবেছিলেন সংসারের বাঁধনে বাঁধতে পারলে হয়তো ওই বিপ্লবী ছেলেটা ঘরবাসী হবে ওই পথ ছেড়ে।

কিন্তু তা হয় নি।

সেই বিদ্রোহী যাযাবর মানুষটাকে বাঁধতে পারে নি ঘরের বাঁধন।

সুধাময়ী বাড়িতে ছিল, আর বসন্তবাবু বাইরে বাইরে সেই অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে ঘুরতেন। ওরা ছিল সবহারানোর দলে। বেপরোয়া—অশান্ত। ওকে বাঁধতে পারে নি সুধাময়ীর মত শান্ত মেয়ে। তাই আবার হারিয়ে গিয়েছিলেন বসন্তবাবু।

সেবার হিলির ওদিকে ধরা পড়ে বেশ কয়েক বৎসর জেলে কাটাতে হয়।

—বাবা!

—এ্যাঁ। বসন্তবাবু চমকে ওঠেন ওই ডাকে।

সাবিত্রী দেখেছে বাবার আজকের এই অসহায় অবস্থাটা।

দেশের কথা তার তেমন মনে পড়ে না। ছেলেবেলাতেই চলে এসেছিল সে এখানে। তখনও তেমন জ্ঞান হয় নি সাবিত্রীর।

আবছা ভেসে ওঠে শিয়ালদ' স্টেশনের ছবিটা। লোকজন গিসগিস করছে। তার মাঝে একটি পরিবার বানে ভাসা খড়কুটোর মত এসে ঠেকেছে সেই জঞ্জালের স্তূপে। তখন থেকেই অভাব কষ্টকে দেখছে সাবিত্রী।

ছেলেবেলা থেকেই নিরাভরণ নিঃস্বতাকেই দেখেছে সে। বাবা তখন এখানে এসে কোথাও কাজকর্মের সন্ধান করছেন।

আজও সেই দিনগুলোকে এরা ভোলে নি।

—বেলা হয়ে গেছে বাবা। চান করবে না? ওঠো।

সাবিত্রী মন থেকে সেই কালো ছবিগুলোকে মুছে ফেলতে চায়। আজকের দিনও তার মনে কোনো আলোকোজ্জ্বল রেখাপাত করে নি।

বসন্তবাবু বলেন মেয়ের কথায়।

—যাচ্ছি মা। আবার একবার বের হতে হবে। বেলা হয়ে এল।

সাবিত্রীও জানে বাবা কোথায় যান। এখন তার একমাত্র আশ্বাস যদি কিছু সুরাহা হয়। একটা পেনসনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন তিনি। এই নিয়ে অশোকও আড়ালে ব্যঙ্গ করে বাবাকে। সে বলে।

—ভাড়াটে দেশপ্রেমিক, আজ তার কাজের দাম চাইতে লজ্জা করে না?

সাবিত্রীর ওসব কথা ভালো লাগে না। অশোক যেন একটা ইতর হয়ে উঠেছে দিন দিন।

অশোকটার কথাবার্তাও বিশ্রী। কাউকে সে মান-খাতির করে কথা বলতে জানে না। ভাবে সব কিছুর উপরই তারা টেক্কা দিয়ে সর্দারি করে যাবে। তার এতো কথা বলার কি আছে? সাবিত্রীও জানে এসব দরখাস্তে কিছুই হবে না।

তাই সাবিত্রী শুধোয় বাবাকে।

—এই সব দরখাস্ত হাতে নিয়ে যাবার কোনো দাম আছে বাবা? কতো জনে কতো কথা বলে। তার চেয়ে তোমার ওই চেনাজানা মন্ত্রী-নেতাদের ধরে করে দাদার একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে বলো না? তবু একটা কাজ হবে বড়দার।

বসন্তবাবু মেয়ের কথাগুলো শুনছেন। এটা তিনিও জানেন। তবু মনে হয় আজকের ছেলেমেয়েরাও নিজেদের সম্মান সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন।

সাবিত্রী বলে চলেছে ঃ

—অনেক মেয়েদেরও ট্রেনিং বা কাজকর্মের প্ল্যান-ট্যান আছে, একটা কিছুর ব্যবস্থা করে দাও আমাকে ওঁদের বলে। নিজেরা খেটেখুটে দিন চালাবো, তোমাকে এই দয়া-ভিক্ষেও করতে হবে না সরকারের কাছে। কাজ করতে পারি, ভিক্ষে নিতে যাবো কেন?

বসন্তবাবু চুপ করে মেয়ের কথাগুলো শুনছেন, ওর মুখে ফুটে ওঠে বেদনার ছায়া। সেই চেষ্টাও করেছেন অবশ্য, কিন্তু কোন সুরাহাই হয় নি। দেখেছেন বসন্তবাবু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে বার বার। ছেলেমেয়ের জন্যে কিছুই করতে পারেন নি।

আজ তাই নিজের জন্যেই এই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বের হতে হয়েছে। ওরা কেউ সেই বেদনার কথাও জানবে না। জানবে তাঁর নির্মম পরাজয়ের বেদনাকে।

সে সব সত্য গোপন করে বলেন বসন্তবাবু ক্ষীণস্বরে।

—তাই দেখবো মা। চল—চানটান করি।

অশোক ততক্ষণে মাথায় দু'-চার ঘটি জল ঢেলে বের হচ্ছে চটের পর্দা-ঘেরা বাথরুম নামক জায়গা থেকে। বাথরুম ওটা নয়, খানিকটা ফাঁকা জায়গা মাত্র ওই চট দিয়ে ঘেরা। এই ভাড়াটাদের সকলের জন্য ওই স্নানঘর।

কয়েকটি পরিবার এখানে মাথা গুঁজে আছে। টানা বারান্দার এপাশে ঘরগুলো। ইটের দেওয়াল, মাথায় টিনের ছাদন, সামনে একফালি উঠোনমত, ওদিকেও টালির সার সার কয়েকটা রান্নার জায়গা। এর হেঁসলের খবর ওই হেঁসেলে পৌঁছে। এ মাংস রাঁধলে সেই সৌভাগ্যের খবর ওপাশে পৌঁছতে দেরী হয় না।

স্নান সেরে অশোক হাঁক পাড়ে—কই মা।

সুধাময়ী মুখ বুজে একটা কলাই করা থালায় ভাত—তাতে ডালের জল খানিকটা ঢেলে একপাশে কুমড়োর তরকারী দিয়ে নামিয়ে দিল।

অশোক ওই সব দেখেশুনে বলে—স্রেফ কুমড়োর ঘ্যাঁট? আর কিছু নেই?

সুধাময়ী জানে এই সবও কি ভাবে জুটছে। বসন্তবাবুকে এখনও এই বয়সে টুইশানি করতে হয়। স্কুলের চাকরীটা এতদিন ছিল তাই এখানে বাসা করার অধিকার পেয়েছিল তখন। ক' মাস রিটায়ার করার পর থেকেই সংসারের চাকাটায় আর তেমন তেল পড়ে নি, ফলে চলতে চলতে আটকে যায়, মাঝে মাঝে কর্কশ আর্তনাদ ওঠে। সে খবর অশোক রাখাতে চায় না।

এতদিন তবু কলেজ করতে হতো, পড়াশোনার ভাবনাও ছিল। একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল ভালোবাবে পাশ করতে হবে তাকে, আর পরীক্ষার বেড়াটা নির্বিঘ্নে সসম্মানে টপকাতে পারলে একটা চাকরী জুটতেও দেরী হবে না। সংসারের হাল বদলাবে। ভালোভাবে বাঁচবে তারা।

অমৃত সেই আশা নিয়েই পড়েছে, অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। কিন্তু তারপর এই একটা কাজ বেড়েছে। তিন মাস অন্তর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে কার্ড রিনিউ করে এসো। কি হবে এতে তা জানে না। তবু করতে হয়।

বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে জানা-শোনা আত্মীয়মহলে অমৃতের কিছুটা সুনাম আছে ভালো ছেলে বলে। তাই দু'চারটে টুইশানি জুটেছে তাতেই কিছু টাকা রোজগার করতে পারে। কিন্তু এতে কোন নিশ্চয়তা নেই।

বেলা হয়ে গেছে। টুইশানি সেরে এসে অমৃত লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পালা এলে কার্ডখানা এগিয়ে দিয়ে শুধোয় অফিসের ভদ্রলোককে।

—একটা কল-টল আসবে না স্যার?

ভদ্রলোক কাউন্টারের ওদিকে মুখ নামিয়ে শুধু যেন বেকার জীবনের পরমায়ু বৃদ্ধির মঞ্জুরী করে চলেছেন। অন্য কথা কানেই তোলেন না। কারণ জানেন এই প্রশ্নের কোনো জবাব তাঁর জানা নেই। তাই চুপ করে থাকেন তিনি।

পিছনকার অপেক্ষমান ভদ্রলোক অমৃতের কথাটা শুনেছে, দেখেছে নিরুত্তাপ ওই ভদ্রলোককে, তাই জানায় সে ওর কথায়।

—উনি তো টেবিল-চেয়ার হয়ে গেছেন দাদা, দারুভূতো মুরারী। ওঁকে কোশ্চেন করেও উত্তর পাবেন না।

হঠাৎ ওদিকে মেয়েদের লাইনে একটা গোলমাল ওঠে। মেয়েরাও এখন এই রুটির লড়াই-এ সামিল হয়ে গেছে, ছেলেদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মুখোমুখি আসরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

ওদের সুন্দর মুখে ফুটে উঠেছে বিবর্ণতার কালো ছায়া, ডাগর কালো চোখে স্বপ্নহীন—আশ্বাসহীন নিঃস্বতাই আজ প্রকট হয়েছে। ওরাও এই রোদে দাঁড়িয়ে আছে লাইনে কার্ড রিনিউ করার জন্য।

তারই মধ্যে লাইন ভেঙে কোন মহিলা নাকি এগিয়ে এসেছেন, তাতেই মৌচাকে ঢিল পড়ার মত ব্যাপার শুরু হয়েছে। গুঞ্জরণ তুলেছে ওই লাইনে একটি মেয়ে।

বলে—দামী শাড়ি আর ওই বাহারের ব্লাউজ পরে রূপচটক দেখিয়ে কাজ সারবে তা হবে না।

অন্য একজন কালো লম্বা সিটকে মেয়ে গলা তুলে জানায় সামনের মেয়েটাকে।

—সরে আসুন আপনি? এতো ডাঁট দেখানোর মানে কি? আমরাও দাঁড়িয়ে আছি।

ছেলেদের মধ্যে অনেকেই যেন বিনা পয়সায় মজা দেখছে। কোন ছেলে মন্তব্য করে সরস কণ্ঠে।

—চালিয়ে যান দিদি। ছাড়বেন না। মেয়েদের কলরব উঠছে ওদিকে। কোন ছেলে গলা তুলে আওয়াজ দেয়—হেল্প করতে হবে নাকি? যাবো?

অমৃতও দেখেছে ব্যাপারটা। ওপাশের মেয়েটির বোধহয় জরুরী দরকার আছে। কি বলেছে সে। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ওই সমবেদনার অভাবটা বেশী বলেই মনে হয়। ওই মেয়েটির চেহারায় পোশাক-আশাকে একটা মার্জিত রুচির ছাপ ফুটে উঠেছে। মেয়েটা সমবেতভাবে তাকে নানা কথা শোনাচ্ছে।

ওই লাইনে দাঁড়ানো মেয়েদের অনেকের তুলনায় ওর চেহারায় একটি শ্রী আর আভিজাত্যের হয়তো কিছুটা রয়ে গেছে এখনও।

ওই মেয়েদের কোলাহলে সে কান দেয় না। কার্ডখানা রিনিউ করে ওদের দিকে না চেয়ে বের হয়ে এল সেই মেয়েটি। পিছনে মেয়েদের লাইন থেকেও তখন তীক্ষ্ণ গলার শব্দ ওঠে। কাউন্টার ক্লার্ককেই এইবার শাসাচ্ছে মেয়েরা।

—সুন্দর মুখ দেখেই গলে গেলেন নাকি স্যা.র?

কোন নীতিবাগীশ পোড়াকাঠ-এর মত মেয়ে শে.নায়।

—পুরুষমাত্রেই এমনি হ্যাংলা। লজ্জা-ঘেন্নার বালাই নেই। ছিঃ।

অমৃত দেখেছে ওই মেয়েদের অনেককে। জীবনে হয়তো কিছুই পায় নি। অভাব দারিদ্র আর ব্যর্থ স্বপ্নের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরছে তারা। চারিদিকে দেখেছে সেই কাঠিন্যটাকেই, তাই সামান্য ব্যাপারে তারা অধৈর্য হয়ে ওঠে। অসহায় রাগে ফেটে পড়ে এমনিভাবে।

অমৃতের মনে পড়ে তার বোনের কথাও। সাবিত্রীরও এখন করার কিছু নেই। বেকার। বিয়ে-থাও দিতে পারে নি।

সাবিত্রীকে যেন দেখেছে সে ওই ব্যর্থ বঞ্চিত মেয়েদের দলে। ঘরের আশ্বাস নেই, ভালোবাসা সেখানে পরিহাস, ওরা সেই পুরানো সবুজ স্নিগ্ধ জগৎ থেকে

বিতাড়িত হয়ে রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ কোন পথেপ্রান্তরে নির্বাসিত হয়েছে। ঘুরে ফিরছে বাঁচার আশ্বাস খুঁজে।

সাবিত্রী নয়—ওই মেয়েরা নয়। আজকের যুগের ছেলেমেয়ে সবাই সেই পথেই এসে নেমেছে। তাই আগেকার চিন্তাধারা, আদর্শ, শালীনতার মাপকাঠিও বাতিল হয়ে গেছে।

একালের এরা পরিণত হয়েছে আদিম নরনারী আদম-ঈভের শ্রেণীতে। তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আদম-ঈভ নির্বাসিত হয়েছিল মাটির পৃথিবীতে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করার অভিশাপ নিয়ে। সেখানে অন্য কোন প্রশ্ন নেই, সৌন্দর্য নেই।

আছে শুধু মরণপণ সংগ্রাম আর নিঃশেষ অবলুপ্তি। তাই মানুষ আবার পায়ে পায়ে আদিম চেতনার তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে হারিয়ে যেতে বসেছে।

সমাজের কোণে কোণে বাসা বেঁধেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক বৃত্তিগুলো। অনেক পথ পার হয়ে আসা মানবসভ্যতা আজ হঠাৎ তার জন্মকালের আদিম প্রবৃত্তি আর কদর্য স্বরূপটাকে দেখে তাই আঁতকে উঠেছে কি আতঙ্কে।

তবে সান্ত্বনার কথা যে এই ভয় আর শিহরণ বোধটাও ক্রমশ কমে আসছে—কালে কালে ভোঁতা—অসাড় হয়ে যাবে বরং তার স্বপক্ষে সে যুক্তি খাড়া করে তুলবে ওই মানবিক ধারণাগুলোই পুরোনো, বাতিল আর সেকেলে। ওরা ঝরাপাতার মতই ঝরে যাবে। সেই মুক্ত মন নিয়ে ওরা আদিম যুগেই ফিরে যাবে আবার সব হারিয়ে।

সেই মেয়েটি এসে ডালহৌসী স্কোয়ারে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ওর ফর্সা মুখে লালচে আভা ফুটে উঠেছে হয়তো নীরব নিষ্ফল রাগে না হয় অপমানে। কিংবা চড়া রোদে বের হওয়া অভ্যাস নেই, রোদের তাপে বের হতে বাধ্য হয়েছে এইজন্য। অমৃতও এসে দাঁড়ালো স্টপেজের শেড-এর নীচে ওর কাছাকাছিই।

মেয়েটি কালো চশমা-পরা চোখ দিয়ে ওকে দেখেই যেন চিনতে পেরেছে তবু একটা কাঠিন্য আর অচেনা ভাব এর জন্য সহজভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে যেন সে দেখে নি—তাছাড়া চেনা-জানাও নেই। বিব্রত বোধ করারও কিছু থাকতে পারে না মেয়েটির।

দুপুরের দিকে ট্রাম কমে গেছে অনেক। রোদও বেড়ে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তারা।

পার্ক সার্কাসের ট্রামের দেখা নেই। অমৃত বিরক্ত হয়ে ওঠে। সকালে বাড়ি থেকে বের হয়েছে এখনও ফিরতে পারে নি। কোনো কাজও তেমন হয়নি।

এদিকের কোন অফিসে এক ভদ্রলোক দেখা করতে বলেছিলেন তাকে, অমৃত গিয়ে তার দেখা পায় নি। বোধহয় ছুটিতে গেছেন তিনি। তাঁর অফিসে একজন লোক নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারও কোনো সংবাদ পায় নি। হতাশ হয়ে ফিরেছে অমৃত।

খিদেও লেগেছে। ওই অনুভূতিটা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। আর ওই জ্বালাটা এতই বিশ্রী যে মনের সব চিন্তা-ভাবনা কমনীয়তাকে কঠিন করে তোলে।

অমৃত এতদিন ধরে সেই যন্ত্রণাকে ভুলে থেকেছে, তবু সেটা তাকে সহজ হতে বাধা দেয়। তার অজানতেই অমৃতের মনকে, মুখের ভাবটাকেও শক্ত করে তোলে ক্ষুধার জ্বালাটা।

ট্রাম আসছে এতক্ষণ পরে।

অমৃত উঠে পড়ে দেখে সেই মেয়েটি উঠেছে একই ট্রামে। মেয়েটি অমৃতকে এই ট্রামে দেখে চাইল তার দিকে। কালো চশমার আবরণে ঢাকা চোখে যে কাঠিন্য আর বিরক্তি ফুটে উঠেছে সেটা অবশ্য অমৃত টের পায়নি।

ধর্মতলা ছাড়িয়ে চলেছে ট্রামটা। কনডাক্টার এসে টিকিট চাইতেই রাত্রি চমকে ওঠে ব্যাগে হাত দিয়ে।

এ-কোণ ও-কোণ খুঁজতে থাকে, তার ছোট পার্সটার সন্ধান মেলে না। তেমন বেশী কিছু টাকা-পয়সা ছিল না, কিন্তু এই মুহূর্তে আঠারোটা পয়সার তার খুবই দরকার।

রাত্রির সারা গা যত ঘামছে, ততই হন্তদন্ত হয়ে হাতড়াচ্ছে ব্যাগটা। কিন্তু পার্সটার পাত্তা নেই।

বোধহয় কাউন্টারে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেরবার জন্য এগিয়ে গিয়ে কার্ড বের করার সময় পার্সটাও খোলা ব্যাগ থেকে কোনমতে বের হয়ে পড়ে গেছে খেয়াল করে নি ওই গোলমালের মধ্যে।

রাত্রি বুঝতে পারে ট্রামের অনেক যাত্রীই তার দিকে কৌতূহলভরে চেয়ে আছে। অনেকের চোখে-মুখে বেশ মজা বোধ করার নিষ্ঠুর আনন্দ। কে ওপাশ থেকে মন্তব্য করে কণ্ডাক্টারকে।

—যেতে দাও না ভাই, দেখছো না পলাশফুল। আসলে কিছুই নেই।

—রাত্রি রাগে অপমানে যেন মাটিতে মিশিয়ে যাবে ওদের কথায়।

হঠাৎ ওপাশ থেকে ট্রাম স্টপেজে দাঁড়ানো, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে দেখা ছেলেটি কণ্ডাক্টারকে বলে।

—দুটো আঠারো পয়সার টিকিট দিন। একটা ওখানে—

অর্থাৎ ভদ্রলোক এভাবে কথাটা বললেন তাতে মনে হয় দু'জনে যেন একসঙ্গেই চলেছে, ওরই টিকিট কাটার কথা। কণ্ডাক্টারই ভুল করে এখানে ওই ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করেছে টিকিট চেয়ে।

কণ্ডাক্টার পয়সা নিয়ে টিকিট দিল অমৃতকে। অমৃত মেয়েটির দিকে চাইবার চেষ্টাও করল না। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে টিকিট দুটো নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আগেকার মতই।

ব্যাপারটা স্বাভাবিক, দর্শকদের অনেকেই হতাশ হয়েছে। ব্যাপারটাতে অবাক হয়েছে রাত্রি। তবু চুপ করে থাকে চলন্ত ট্রামে।

সকাল থেকেই মন-মেজাজ ভালো নেই রাত্রির। বাড়ির সমস্যাগুলো আরও জটিল হয়ে উঠেছে। পুরোনো পরিচয়ের জের ধরে একটা খবর পেয়েছিল—যে কোন অফিসে চাকরী একটা হতে পারে।

তারই জন্য কার্ডটা রিনিউ করে নাম্বারটা পাঠাতে হবে। এই ব্যাপারে গেছল রাত্রি, সেখানেও দেখেছে ওদের ওই ব্যবহার।

তারপর ট্রামে এই ঘটনাটায় তার মন বিষিয়ে উঠেছে। ওই ভদ্রলোক যেন তাকে ইচ্ছে করে উপকার করার জন্যই সব জেনে একই ট্রামে উঠেছে তার পিছু পিছু।

পার্ক সার্কাস এর কাছে আসতেই অমৃত নামবার জন্য এগোচ্ছে। এখান থেকে নেমে বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে তাকে রেলব্রীজ পার হয়ে তবে বাড়ি পৌছবে। বেশ খানিকটা পথ।

দুপুরের রোদ বেড়ে উঠেছে। পার্কের রেইনট্রি গাছের নীচে ছায়া-আলোর আঁকি-বুকি। পাখীগুলো ক্লান্ত হয়ে উড়ে এস জিরুচ্ছে। ঘাসের উপর গামছা পেতে ছায়ার ঠাণ্ডা ভাবটা তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করে ক্লান্ত কিছু মানুষ। চারিদিকে ঢিলেঢালা চুপচাপ ভাবটা ফুটে ওঠে।

অমৃত ট্রাম থেকে নেমে ওই পথের দিকে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ পিছনে কার ডাক শুনে দাঁড়ালো। একটু অবাক হয়েছে সে—সেই মেয়েটিও ট্রাম থেকে এখানেই নেমে পড়েছে আর তাকেই দাঁড়াতে বলছে। কি ভেবে দাঁড়ালো অমৃত। মেয়েটি এগিয়ে আসে।

সে চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেলতে অমৃত ওর মুখখানার সবটাই দেখতে পায়। কালো চোখ দু'টোয় হয়তো বিরক্তি না হয় কাঠিন্য মেশানো।

মেয়েটি বলে—আপনার টিকিটের দাম—

অমৃত বুঝতে পারে সেই ব্যাপারটা। তাই জানায় সহজভাবে।

—ওর জন্য ভাববেন না। তাছাড়া পার্স তো আপনার হারিয়ে গেছে। দাম দেবেন কোথা হতে এখন?

—কিন্তু পয়সাটা? মেয়েটি ইতস্ততঃ করে। ব্যাপারটা তারও বিশ্রী লাগে।

একটু হেসে অমৃত জানায়।

—আঠারো পয়সার ঋণ রাখতে চান না? অবশ্য বেকার মানুষের কাছে ওরও দাম আছে। তার জন্য যদি বাড়তি খরচা না করতে হয় বলুন কোথায় গেলে পাবো, একদিন না হয় গিয়ে নিয়ে আসবো সময় করে।

মেয়েটি ওকে দেখছে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চুপ করে।

সাধারণতঃ পথে ট্রামে-বাসে মেয়েদের গায়ে-পড়া ছেলেদের টাইপ রাত্রি চেনে, একে দেখে তেমন বোধ হয় না। পরনে সাধারণ ধুতি আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী, পায়ের স্যাণ্ডেলটা দেখে মনে হয় চলেফিরেই একে অন্ন যোগাতে হয়। মুখচোখের রুক্ষতা আর কাঠিন্য ছাপিয়ে একটা মার্জিত রুচির ছাপ ফুটে ওঠে। যদিও সেটা রুক্ষতায় কঠিন।

অমৃত ওর মনের এই ভাবনাগুলোকে ঠিক ছুঁতে পারে না। অমৃতের মনে হয় মেয়েটি তার ঠিকানাই চেয়ে বসবে যাতে পয়সাটা পৌঁছে দিতে পারে।'অমৃত জানে ওই জেদী মেয়েরা সব পারে। ওদের বাড়ির পরিবেশ অমৃত চেনে। তাই এড়াতে চায় সে মেয়েটিকে। মেয়েটি তাকে দেখছে নিরীখ করে। অমৃত জানায় শান্ত কণ্ঠে।

—আমি যেখানে থাকি সেটা দূরেই। তাছাড়া আধাবস্তি গোছের বাড়িই, বারোয়ারী বাড়িই বলতে পারেন, বসতে দেবার ঠাঁইও নেই।

রাত্রি ওর কথা শুনে হেসে ফেলে। বলে সে।

—না। সে কথা বলছি না। তবে চিনি আপনাকে। কোথায় যেন দেখেছি। হ্যাঁ, কড়েয়া রোডে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

অমৃত জানায়।

ওখানে আমার এক ছাত্রের বাড়ি। পড়াতে যেতে হয়—পথে দেখে থাকবেন।

—তাই নাকি! তাহলে আসুন না একদিন সকালে। এই আমার ঠিকানা।

একটুকরো কাগজে ঠিকানা লিখে দিল রাত্রি।

অমৃত অবাক হয় ওর সাহস দেখে। তাই ফস্ করে বলে।

—আপনার সাহস কম নয়তো?

—কেন? হালকা সুরে সুধালো রাত্রি।

ওর মুখের জড়তা কেটে গেছে এখন।

অমৃত বলে—চেনা নেই, জানা নেই একজন কে-না-কে তাকে বাড়ির ঠিকানা দিলেন?

রাত্রির মুখে মিষ্টি হাসির আভাস বিবর্ণ মেঘের আড়ালে এক ফালি চাঁদের আলোর আভার মত ফুটে ওঠে। বলে—মেয়েরা একটা হিসেবে বোধহয় ভুল করে না।

অমৃতও হাসছে ওর কথায়।

দু'জনে হেঁটেই পথটুকু পার হয়ে চলেছে। পার্কের গা ঘেঁসে পথ। দু'দিকে গাছগাছালির ছায়া ছায়া ভাব এই দুপুরের রুক্ষ-তপ্ত রোদের নিঃস্বতাকে স্নিগ্ধতার দাক্ষিণ্যে মনোরম করে তুলেছে। অমৃতের মনে হয় এই ক্ষণিক পথচলাটুকু অনেক তৃপ্তির।

অমৃতের দেহের অণুপরমাণুতে তখনও ক্ষুধার জৈবিক তাড়না রয়েছে। স্নান হয় নি। সামনে চাকরী-বাকরীরও আশা তেমন কিছু নেই, একতলা টিনের বাড়িটায় তার জন্য জমে আছে অসন্তোষ, তবু এই ক্ষণিক পথচলা ছায়া ছায়া স্নিগ্ধতার স্পর্শ ওই মেয়েটির সান্নিধ্য একটু ক্ষণের জন্য মনকে হয়তো সজীব করে তোলে। অমৃত যেন নোতুন কি পেয়েছে।

বড় রাস্তার ধারে এসে এদের পথ বেঁকে গেল দু'দিকে।

অমৃত বলে—চলি।

রাত্রি দাঁড়িয়েছে। চারদিকে রোদের উত্তাপ।

তবু মনের রমনীয়তা সেই জ্বালাকর পরিবেশকে ক্ষণিক স্নিগ্ধতায় ভরে দিয়েছে।

রাত্রি বলে—সময় পেলে আসবেন কিন্তু।

পিচগলা রাস্তা দিয়ে চড়াই ভেঙে রেলব্রিজে উঠছে অমৃত, জীবনের পথের মতই

এ পথ বন্ধুর রৌদ্রদগ্ধ আর পূতিগন্ধময়। বাতাসে বন্দেলের দিককার ট্যানারির চামড়া পচার গন্ধ ভেসে আসে। সেই গন্ধটা ওদের মনেও বাসা বেঁধেছে। উত্তপ্ত পূতিগন্ধময় আকাশ-বাতাস তবু কি যেন স্বপ্ন দেখে সে। হাসি আসে অমৃতের। পথে কি গোলামাল শুনে অমৃত দাঁড়ালো পথের একপাশে।

কারা এই রোদে ফেস্টুন-ব্যানার পোস্টার নিয়ে শোভাযাত্রা করে চলেছে পরম উৎসাহে। কোথায় কোন্ কারখানা বন্ধ হয়েছে তাদের জন্য এরা কলকাতার এই প্রান্ত থেকে জমায়েত হতে চলেছে। ময়দানে বিরাট জনসভা হবে তাই দিক-দিগন্তর থেকে চলেছে মানুষ, এরাও চলেছে ওই রোদে দল বেঁধে স্লোগান দিতে দিতে।

অশোককে দেখেছে অমৃত ওই মিছিলের ভিড়ে। ছেলেমেয়ে—বয়স্ক লোকজন, এদিককার তাবৎ বস্তির মেয়েছেলেকে নিয়ে চলেছে তারা।

অধিকাংশ ওই মানুষগুলো জানে না কেন—কোথায় চলেছে তারা। গোবর্ধনবাবুর গাড়িটাকেও দেখা গেল, ক'জন তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে কি নির্দেশ নিয়ে আবার জোর গলায় স্লোগান দিতে থাকে। কলরব উঠছে। ওরা পথ জুড়ে এগিয়ে চলেছে কি উৎসাহে।

জনতার দরদে তারা কলকণ্ঠে কলরব তুলে চলেছে। রোদের তাপে অশোক ঘামছে—তারও উৎসাহ কম নেই। পায়েব স্যাণ্ডেলটা ক্ষয়ে গেছে। ময়লা পাঞ্জাবী ঘামে বিবর্ণ, শীর্ণ মুখে চোখে কি উত্তেজনা ফুটে ওঠে। হাতটা শূন্যে তুলে সে চীৎকার করে স্লোগান দিচ্ছে।

অমৃত অবাক হয়েছে। অশোক-কলেজেও যায় নি, পরীক্ষা নাকি সামনে। আজ অমৃত ওকে বলেছিল কলেজে গিয়ে পরীক্ষার খবর আনতে কিন্তু তা যায় নি। ওই সব দলে মিশে হঠাৎ অশোক যেন কি একটা নেতৃত্বের সন্ধান পেয়েছে। তাই নিয়ে ও খুশী।

অথচ অমৃত জানে কতো কষ্টে অশোকের ফিস্-এর টাকা, কলেজের বাকী মাইনের টাকা সে জোগাড় করেছে। এখনও সেই ছাত্রের বাবার কাছে হাত পাততে পারে নি অমৃত। তবু ভদ্রলোক টাকাটা আগাম দিয়ে মুখরক্ষা করেছিল। নিজেকে অনেক ছোট করেছিল অমৃত।

কিন্তু কেন? কি তার সার্থকতা তা বুঝতে পারে না অমৃত। তার সব সদিচ্ছাকেই পায়ের নীচে মাড়িয়ে দিতে চায় অশোক। ওর সম্বন্ধে অশোকের ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রকম, আর তাতে যে শ্রদ্ধা-ভালবাসার কিছুমাত্র নেই সেটাও অমৃতের অজানা নয়।

অশোক তারস্বরে স্লোগান দিয়ে চলেছে।

—দালাল কো হালাল করো।

দালাল! ওদের মতে না মিললেই তাদের বিরুদ্ধে ওদের এই সব বিযোদগার আর আক্রমণ-পর্ব চলে।

খেতে বসে বাড়িতে অশোক সেদিন তাকে ওই দালাল কথাটাই বলেছিল। অমৃত প্রতিবাদ করে নি। বরং তার বাবা বসন্তবাবুই চমকে উঠেছিলেন অশোকের কথায়।

—কি যা-তা বলছিস অশোক? চুপ করে খেতে থাকে অশোক, জবাব দেয় নি। অমৃত উঠে গেছল খাওয়া সেরে। এ সবের জবাব দেওয়া থেকে বিরত ছিল অমৃতও।

শুধু চমকে উঠেছিল ওর অমানুষিকতায়।

ওরা চলে গেল। অমৃত ব্রিজের ওপাশের উৎরাই বেয়ে নামছে। বেলা হয়ে গেছে। দুপুর গড়িয়ে চলেছে।

সুধাময়ী দেখেছে সংসারের হালটা কেমন বেহাল হয়ে চলেছে। বসন্তবাবু কোচিং ক্লাশ করে যা হয় পান, অমৃত পাশ করে এখান ওখানে কাজের চেষ্টায় ঘুরছে। বাড়ি ফেরার তার ঠিক সময় নেই।

বেলা হয়ে গেছে অনেক।

বসন্তবাবু খেয়ে দেয়ে কি কাজে বের হয়ে গেছেন। অশোকও চলে গেছে আগেই। তার পড়াশোনার ব্যাপার প্রায়ই বন্ধ হয়ে গেছে, সুধাময়ীও অশোককে বলে পারে নি। এ বাড়ির ও যেন কেউই নয়।

বুড়ো বসন্তবাবু, অমৃত, এমনকি সাবিত্রীও বোঝে এ বাড়ির অবস্থাটা। তারা চেষ্টা করছে অচল চাকাটাকে সচল করতে। আর অশোক ওদের শুধু ব্যঙ্গ করে তীক্ষ্ণ কথায়। সুধাময়ীকে সংসারের বোঝা টানতে হয়। সাবিত্রী সেলাই-এর স্কুলে টুকিটাকি কাজ করে, এই সময়টা সেও নেই। স্কুলে গেছে।

সুধাময়ীর কাজ চুকিয়ে স্নান সেরে খাওয়ারও অবকাশ নেই। অমৃত এখনও ফেরে নি। নিজে খেয়ে নিয়ে ছেলের জন্য তলানি কাঁকর-ভরা কড়কড়ে ভাত—ঠাণ্ডা ডাল-তরকারী রাখতে তার মন চায় না। তাই অপেক্ষা করে, কিছু কাপড় কাচার কাজ সেরে নেয়।

এপাশের দত্তগিন্নীর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, ভূপেন দত্ত কোন অফিসে কাজ

করে। মাইনে ভালোই পায়। তাই এ বাড়ির অন্য সব ভাড়াটের তুলনায় তার অবস্থা স্বচ্ছলই। মেয়ে বাসন্তী কলেজে ভর্তি হয়েছে। ছেলেটা ছোট তবু তার জন্য পড়াব বন্দোবস্ত করেছে সবরকমই। বসন্তবাবুকে মাসকাবারে কিছু টাকা দিয়ে রেখেছে পড়ানোর জন্য।

সব দিক থেকে লতিকা এ বাড়ির অনেকের কাছে উঁচুতলার মানুষ।

ওর স্বামী মহীমবাবু কোন ব্যাঙ্কে কাজ করে। লতিকা বলে।

—জায়গা কিনেছি মাসীমা, এবার একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে চলে যাবো। ততদিন কাটিয়ে দিই এখানেই।

ওই লতিকা একটু দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেছিল আজ, তখনও সুধাময়ীকে একগাদা ক্ষার কাচতে দেখে বলে।

—আপনি এখনও কাচবেন মাসীমা? সাবিত্রীকে বললেন না কেন? ও করে দিতো।

সুধাময়ী বলে লতিকার কথায়।

—ওর তো আবার স্কুল আছে, নিজেই কেচে নোব।

লতিকা শোনায়।

—তবু আপনি পারেন, সাবিত্রীও দেখি করে কাজকম্মো। আমাদের তো লোকজন না থাকলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এত কাচাকাচি কাজকম্মো করলে হাত শক্ত হয়ে যাবে। এই নিয়ে কি কম টাকা জলে দিচ্ছি মাসীমা। আর ধোপার খরচার কথা বলবেন না।

অর্থাৎ লতিকা শুনিয়ে দেয় তার সংসারের খবরটাও, সুধাময়ীও বোঝে সেটা। এই দারিদ্র্যের ছাপটাকে সে আর ভয় করে না। সহ্য করে নিয়েছে এখানে এসে।

অতীতে তারও এই দিন ছিল না। এখন মুখ বুজে সব সহ্য করে সুধাময়ী সংসারের বোঝা টেনে চলেছে ধোপার গাধার মত।

এ সব কিছু তবু সুধাময়ী সহজে মেনে নিয়েছে। তাই লতিকার কথায় বলে এসব তো নিজেকেই করতে হয় বাছা। জানো তো সংসারের হাল। এখনও অমু ফিরলো না। কোথায় যেন জরুরী কাজে যাবো বলে গেছে।

লতিকা শুধোয় কৌতূহলভরে।

—কাজকম্মো কিছু হল অমুর?

সুধাময়ী ঘাড় নাড়ে, জানায়—কই বাছা। মহীমবাবুর অফিসেও শুনেছি লোকজন নেয়। একটু বলে দ্যাখো না মহীমবাবুকে।

লতিকা নিজেকে কেউকেটা ভাবে। তাই বলে একটু গর্বভরে।

—আফিসে অবশ্যি ওকে সবাই মান-খাতির করে। সাহেব তো নিজেই ওকে খুব ভালোবাসেন। দেখবো—

অমৃত বাড়ি ঢুকছিল, দরজাটা এ বাড়ির খোলাই থাকে। কারণ কয়েক ঘর বাসিন্দা। কে কখন আসে-যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে অমৃত থমকে দাঁড়ালো। লতিকা বৌদির সঙ্গে মা কথা বলছে।

মায়ের ওই কথাগুলো শুনতে তার ভালো লাগে না। নিজেদের এই অসহায় অবস্থার কথা অপরকে শুনিয়ে নিজেদের বারবার ছোটো করতে খারাপ লাগে অমৃতের। তাছাড়া ওঘরের মহীমবাবুর যে কোন হাতই নেই, সে একটা ব্যাঙ্কের কেরানী মাত্র, এটা মা জানে না। অমৃত জানে সেখানে চাকরীর কথা বলা বৃথা।

মুখ বুজে ঢুকলো অমৃত।

সুধাময়ী ছেলেকে দেখে বলে।

—এতো দেরী হল যে তোর? কোনো খবর-টবর কিছু পেলি?

মায়ের এই প্রশ্নটা যেন চিরকালের। ব্যাকুলতা মেশানো প্রশ্ন।

অমৃত জানে এ বাড়ির অন্তত ওই একটা মানুষ ব্যগ্রভাবে চেয়ে থাকে তার দিকে, কোন সুরাহা হল কিনা জানতে চায় সে। কারণ অমৃতের একটা কিছু খবরের উপর এ সংসারের ক'টি প্রাণীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

অমৃত জবাব দিল না। কারণ জবাব দেবার মত কিছুই নেই। অবস্থাটা বদলায় নি।

লতিকাই ফোড়ন কাটে।

—তেতে-পুড়ে এল অমু, এখন স্নান-টান করে খেয়ে নিক। তারপর শুধোবেন ওসব কথা।

সুধাময়ীর নিজেরও এটা বাধে, ছেলেটার শুকনো মুখ দেখে কিছুটা বুঝে নিয়ে বলে।

—চান-টান করে নে বাছা।

সুধাময়ীরও মনে হয় কোন সুখবর থাকলে অমৃত নিজেই তা জানাতো।

সেও চেষ্টার কসুর করছে না। মা তাকে ঐসব বলে অমৃতের দুঃখটাকেই বাড়িয়ে তুলেছে মাত্র ভুল করে সে।

মায়ের মন অসহায় বেদনায় এই হৃদয়হীন ভুলগুলোকে স্বীকার না করে পারে না মনে মনে।

বসন্তবাবু এই রোদেও এগিয়ে চলেছেন। এককালে শক্তসমর্থ পেটা স্বাস্থ্য ছিল। সেদিনের কঠিন জীবনযাত্রা, সেই উত্তেজনাময় দিন যাপন—তারপর দীর্ঘ দিনের কারাবাস তার দেহমনের সেই কাঠিন্যকে ভেঙে দিয়েছিল যৌবনেই। কিন্তু তাতেও হার মানেন নি।

সেদিন বিক্রমপুর পরগণার গ্রামে মাস্টারি করে দিন কেটে যেতো, বাড়ির জমি-জারাত থেকেও আয়-টায় ছিল। হঠাৎ সেই নিশ্চিন্ত দিনগুলো কোন্ অন্ধকারে হারিয়ে গেল দেশবিভাগের আবর্তে।

সেই ঘর—পায়ের নীচে মাটি হারিয়ে আজ এই দেশে এসে বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরছেন। বাঁচার আশায় ধুঁকছেন। তাই এসেছেন এই অফিসে।

দপ্তরে দরখাস্তাখানা জমা দিয়ে বসে আছেন বসন্তবাবু। রজনী, ভুবনবাবু ওরা এখন নাকি এ্যাসেমব্লিতে। ওদের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

কেরানীবাবুই বলেন—ওঁদের ফেরার ঠিক নেই। কাজের মানুষ।

বসন্তবাবু রোদে গরমে হাঁপিয়ে পড়েছেন। বাইরে রাস্তায় তখনও পিচগলার উত্তাপ উঠছে। বের হয়ে হেঁটে ঘরে ফেরবার সাধ্য নেই। তাছাড়া এতদূর এসে দেখা না করে ফিরতে মন চায় না।

তাই বলেন—একটু বসে দেখি, যদি ওরা ফেরেন। হ্যাঁ বাবা, একটু খাবার জল পাবো?

তেস্টা পেয়েছে ভয়ানক। গলা শুকিয়ে আসে তাঁর।

কেরানীবাবু গজগজ করেন। ওকে সরাতে পারলে এই পড়ন্ত বেলায় তবু বিশ্রাম করা যেতো, কিন্তু বুড়োর দলের জন্য শান্তি নেই।

ওরা কবে অতীতে কি করেছিল তারই দাবী নিয়ে এখনও অনেক কিছু পেতে চায়। দপ্তরের কর্তাদের অনেকের সঙ্গে চেনা-জানা, আর কিছু না হোক ভালো-মন্দ কিছু তাঁদের কাছে লাগিয়ে বিপদে ফেলতে পারে।

সেবার তো কার কাছে প্রণামী চেয়ে যা ঝামেলায় পড়েছিল তার কথা নেই। সেই বখেয়া ছাড়াতে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল? সেই থেকে গোবিন্দ সেন সামলে নিয়েছে। তবু ওদের দেখতে পারে না।

বুড়োর জল খাবার কথা শুনে মনে মনে বিরক্ত হয় গোবিন্দ সেন। ঘাটের মড়ার দল এখানে ধুঁকতে আসে আর তাদের জ্বালায়।

বসন্তবাবু ওকে কথাটা আবার বলেন—একটু জল--খাবার জল? গোবিন্দ সেন বলে ওঠে,—ওই কল আছে, যান।

এগিয়ে গেলেন বসন্তবাবু।

কলের জল তো নয়—চায়ের গরম জল, চা-পাতা দিলেই লিকার হয়ে যাবে। দুপুরের রোদে ট্যাঙ্কগুলো তেতে উঠেছে। একঢোক জল মুখে দিতে জিব পুড়ে যায়, তৃষ্ণা নিয়েই এসে বেঞ্চে বসলেন বসন্তবাবু। গরমে ঘামছেন; তবু চোখ বুজে আসে ক্লান্তিতে।

ওপাশের ঘসা কাঁচের পার্টিসান ঘেরা ঘর, একজস্ট ফ্যান ঘুরছে।

বোধহয় এয়ারকুলার লাগানো। বসন্তবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন। রজনী আর ভূপেনবাবুর সঙ্গে বসন্তবাবুও সেবার নীলবাড়ি ট্রেন ডাকাতিতে ছিল। বসন্তবাবুই ছিলেন সেই এ্যাকশনের প্ল্যানমেকার। তার সাহস বুদ্ধি তখন ঢাকার বিপ্লবী দলের কাছে স্বীকৃত। রজনীর তখন গোঁফ ওঠে নি আর ভূপেনকে দেখেছিলেন হিলিতে।

বসন্তবাবুর নামে পুলিশের ওয়ারেণ্ট ঘুরছে। তবু দলের জন্য টাকা চাই। যোগ্য কর্মী চাই। বসন্তবাবুই এদের এনেছিলেন। আরও কত ছেলের কথা মনে পড়ে তাদের তিনিই দলে আনেন।

ভূপেন, রজনী এখন নামকরা নেতা। কয়েকবার এম-এল-এ হয়েছে রজনী। এবার তাই মন্ত্রী করা হয়েছে তাকে।

সেই ছেলেটার ছবি আজও ভেসে ওঠে বসন্তবাবুর চোখের সামনে। রাতের অন্ধকারে ওরা লাইনের ধারে বসে আছে ঝোপের মধ্যে। খবর আছে অনেক ক্যাশ আসছে এই ট্রেনে---দলের টাকা দরকার। তাই বিদেশী সরকারের টাকার দিকেই তাদের নজর। ওই ক্যাশ লুট করতে হবে সব।

ট্রেনখানা কাছাকাছি এলেই আগেকার ব্যবস্থামত চেন টানা হবে; রাতের অন্ধকারে ওই গার্ডভ্যানের উপর চড়াও হবে তারা।

রজনীও বসে আছে, দূরে অন্ধকারে ট্রেনের আলোটা জেগে ওঠে—মাটি কাঁপছে গুরু গুরু শব্দে, পাশের রেল লাইনে মৃদু শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে আগত ঝড়ের শব্দের মত।

ট্রেনটার তীব্র সন্ধানী আলো-আঁধার ফুঁড়ে কঠিন শাসনের ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

প্রতিটি মুহূর্ত ওদের ধমনীতে শিহর আনে। তাদের উপর নির্ভর করছে অনেক কাজ বড় দায়িত্ব।

—বসন্তদা, অস্ফুট কণ্ঠে যেন আর্তনাদ করে ওঠে রজনী। এই উত্তেজনায়, সে শিউরে উঠেছে।

কাঁপছে রজনী। ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে। চরম মুহূর্তে ও কি দুঃসহ আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে কাঁপছে—ওর সব শক্তি ফুরিয়ে আসে।

—এ্যাই! বসন্ত ধমকে ওঠে। ওর কাঁধে একটি থাবড়া মেরে গর্জন করে চাপা স্বরে—স্টেডি রজনী। এ্যাকসন্! বসন্ত ওকে সাহস দেয়।

ট্রেনটা এসে পড়েছে, আলোর তীব্র উজ্জ্বলতা ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়. চেনও টানা হয়েছে। চাকায় চাকায় ভ্যাকুয়াম ব্রেকের ঘর্ষণে ফিনকি দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়—ছিটিয়ে পড়ে প্রবল বেগে। ওই কঠিন ইস্পাতের চাকায় চাকায় অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। গাড়িটা প্রচণ্ড শব্দে আর্তনাদ করে থামছে।

অন্ধকারে কয়েকটা ফায়ারিং-এর শব্দ ওঠে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যাত্রীদের ভয় দেখায় তারা।

— গেট আপ রজনী। চার্জ!

ভয়কাঁপা ছেলেটাকে কি প্রচণ্ড প্রাণশক্তি দিয়ে আচ্ছন্ন করেছে বসন্ত। ছায়ামূর্তির দল হানা দিয়েছে ব্রেক-ভ্যানে। প্রচণ্ড আঘাতে দরজাটা খুলে যায়।

হকচকিয়ে ওঠে বসন্তবাবু একটা শব্দে। ঝকঝকে গাড়িখানা এসে থামতেই দরজা খুলে বের হয়ে আসছেন রজনীবাবু। পরণে খদ্দরের পাঞ্জাবী, হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ। অফিসের রূপ বদলে গেছে নিমেষের মধ্যে।

বেয়ারা ঘুমন্ত অবস্থাতেই যেন টুল ছেড়ে উঠে পড়েছে। বাবুদের মধ্যেও সাড়া পড়ে যায়।

বসন্তবাবু এই বেঞ্চেই কখন ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। উঠে দাঁড়াতেই দেখেন সামনে দিয়ে দীর্ঘদেহী একটা মানুষ এগিয়ে গিয়ে ওই চেম্বারে ঢুকে গেল তার দিকে না চেয়ে।

বসন্তবাবু পিছন পিছন যেতে গিয়েই বাধা পেয়ে থামলেন।

ঘুমন্ত বেয়ারা এখন সজাগ প্রহরী হয়ে উঠেছে। সেইই বাধা দেয় কঠিন স্বরে—অন্দর মৎ যাইয়ে বাবু! ঠারিয়ে।

সে দাঁড় করিয়ে দিল বসন্তবাবুকে। এখন সে অন্য মানুষ। বাধা পেয়ে বসন্তবাবু অবাক হন।

—রজনীর সঙ্গে দেখা হবে না? বলো—বসন্তবাবু এসেছেন। একটু খবর দাও, জরুরী দরকার।

—স্লিপ দিজিয়ে। বেয়ারা হিমশীতলভাবে কথাটা জানায়।

কেরানীবাবুও এইবার খিঁচিয়ে ওঠে বসন্তবাবুর ওই প্যানপ্যানানিতে।

—সব সময় যদি ভিড় করেন মশাই ওঁরা কাজ করবেন কখন?

বসন্তবাবু চুপ করে থাকেন ওই অপমান সয়ে।

বসন্তবাবুর স্লিপটা নিয়ে ভিতরে গেল বেয়ারা দয়া করে।

বসন্তবাবুরই গরজ তাই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ওদের কথাগুলো শুনেও। মনে হয় রজনী তার নামটা দেখে এখুনিই ডাকবে তাকে, আর বসন্তবাবুও দেখিয়ে দেবেন যে সে লোক তিনি নন। আজকের ওই কর্তা-ব্যক্তি রজনীবাবুকেই তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ছিলেন, তাঁর গুরু তিনিই।

বসন্তবাবু দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ।

কোথাও কোন সাড়া নেই। বেয়ারা বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলে।

—আজ টাইম নেহি হ্যায়। দুসরা রোজ আইয়ে।

বসন্তবাবু চমকে ওঠেন, সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল।

—এ্যা। মানে রজনীকে বলছো তুমি। ও বাবা?

বেয়ারা জবাব দিল না। ও ফাইল-পত্র নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। বসন্তবাবুর সেই আশার রঙীন বেলুন চুপসে গেছে। বসন্তবাবুর মনে হয় তাব ঘাড়ে কে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায় এখান থেকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন।

সেদিনের রজনী আজ অনেক উপরে উঠে গেছে, কোনদিন বসন্তবাবু তাকে এই

পথে এনেছিল সে সব কথা আজ অপ্রাসঙ্গিক। মনে রাখার দরকার নেই। উপরের তলায় উঠতে গেলে অনেক সিঁড়ি মাড়িয়ে ধাপে ধাপে উঠতে হয়। সেই সিঁড়িগুলোর খবরও তারপর আর কেউ রাখে না।

রজনীবাবু তাই আজ ভুলে গেছেন তাকে।

হতাশ বয়ে বসন্তবাবু বের হয়ে আসছেন।

হঠাৎ কি ভেবে ওপাশের ফর্ম জমা নেবার কাউন্টারের সেই ভদ্রলোকটিকে বলেন তিনি।

—দরখাস্ত আর ফর্মটা ঠিক জায়গায় যাবে তো বাবা?

ওই একমাত্র আশ্বাস তিনি পেতে চান, বসন্তবাবুর কাছে রজনীবাবুর বদান্যতাও অর্থহীন বলে মনে হয়। তবু যদি দয়া করে তাঁরা কিছু করেন এইটা আশা করেই শুধোন কথাটা।

ভদ্রলোক ওর দিক চাইল। বসন্তবাবুর চোখদুটো চকচকে হয়ে ওঠে।

গোবিন্দ সেন এতক্ষণ দেখছিল বুড়োকে। জানে সে এমনিই হয়। কর্তারা অনেকেই আগেকার চেনা হতদরিদ্র মানুষগুলোর সঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায়, কারণ ওদের অনেকেই আসে ওই একই কারণে কিছু দয়ার প্রত্যাশী হয়ে।

তবু গোবিন্দ সেন এখানে বসে অতীত ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত চরিত্রকে দেখছে। তাই বলে সান্ত্বনা স্বরে।

—হ্যাঁ ঠিক পৌঁছবে।

বসন্তবাবু ওর কথাগুলো যেন শুনতে পান নি, কোনরকমে বের হয়ে এলেন রাস্তায় বিবর্ণমুখে।

রোদের তেজ কিছুটা কমেছে। এখন তত দাপট আর নেই। এর মধ্যেই রাস্তায় অপিসের কিছু লোকজনকে দেখা যায়, ওরা চলেছে বাড়ির দিকে। ফিরতি ট্রামের ভিড় শুরু হয়েছ। যাত্রীদল চলেছে বাড়ির দিকে।

ট্রামে তেরটা পয়সা নেবে এখান থেকে। তবু এসপ্লানেড অবধি হেঁটে গেলে দশ পয়সায় হবে, আর যদি কোনরকমে বাকী পথ হেঁটে যেতে পারেন ওটাও বাঁচবে।

বসন্তবাবু হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন এসপ্লানেডের দিকে। ময়দানে বোধহয় মিটিং আছে, সারবন্দী লোকজন চলেছে শোভাযাত্রা করে। তাদের ভিড়ে গাড়ি বন্ধ। রাস্তা

পার হবারও উপায় নেই। গাড়ি মানুষ গিসগিস করছে। বসন্তবাবুর দাঁড়াতে কষ্ট হয়, বয়স হয়েছে। পা দুটো টনটন করে দাঁড়ালে, বাতের পুরোনো ব্যথাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তবু চলাফেরা করলে এটা ততটা জানান দেয় না। দাঁড়িয়ে থাকলে কটকটিয়ে ওঠে বেদনাটা। বসন্তবাবু তাই ধীরপদে চলার চেষ্টা করেন।

জনস্রোত চলেছে। নানা ফেস্টুন-ব্যানার নিয়ে চীৎকার করতে করতে চলেছে আপিসের বাবুরা রাস্তা জুড়ে।

ওই চলমান শোভাযাত্রার মধ্যে একটু ফাঁক পেয়েই বসন্তবাবু তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা পার হতে যাবেন হঠাৎ তার হাতটা কে খপ্ করে ধরে ফেলে লাফ দিয়ে এসে।

অতর্কিত ধাক্কায় হাতের লাঠিটা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। তিনিও কোনরকমে পড়তে পড়তে রয়ে গেছেন।

একটা ছেলে তার এইভাবে বাস্তা পার হবার চেষ্টাটাকে অমার্জনীয় অপরাধ মনে করে গর্জে ওঠে।

ও যেন এদের মিছিল ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছে ইচ্ছে করে। ওরা গর্জে ওঠে—ধর ব্যাটাকে।

ততক্ষণে একটি ছেলে তাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে ওই লাইনের সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে জোর করে। গর্জায় সে।

—মিছিল যাচ্ছে, বুড়ো শয়তান চোখে দেখতে পাও না? মিছিলের মধ্যে দিয়ে ঠেলে চলেছো ওপারে। মারবো এ্যাক্ থাপ্পড়।

আশপাশ থেকে উত্তেজিত শোভাযাত্রীরাও যোগান দেয়।

—দালাল ব্যাটা। দাও ওটার পিঠে কষে দু'ঘা বসিয়ে। ঠাণ্ডা করে দাও।

বসন্তবাবু ওদের প্রচণ্ড টানে ছিটকে পড়লেন, কোনরকমে আর্তনাদ করে বলেন কাতর স্বরে ওদের উদ্দেশ্যে।

—জানতাম না বাবা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পাগুলো টাটিয়ে গেছল। তাই ভাবলাম রাস্তা পার হয়ে নিই, দেরী হয়ে যাচ্ছিল।

—সাট আপ্। আবার বচন ঝাড়া হচ্ছে? বুড়ো ভাম কোথাকার। চলো—চলো এইবার টেনে নিয়ে যাবো তোমাকে এই মিছিলের সঙ্গে। চলো—

দু-চারজন পথচারীও দেখছে ব্যাপারটা। নিরীহ একটা বুড়ো মানুষকে ধরে ওরা অপমান করছে, ধাক্কাও দিয়েছে। কি ভেবে সেই বীর তরুণ বসন্তবাবুকে শাসায় কঠিন স্বরে।

—খবরদার এসব করবে না। ডিসিপ্লিন জানো না?

একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে লাইন থেকে ঠেলে বাইরে বের করে দিল, বসন্তবাবুও রাস্তার উপর ছিটকে পড়েছেন এইবার। তবু গাড়িটাড়ি ছিল না তাই রক্ষে। হাঁটুটা ছড়ে গেছে—কাপড়ে লেগেছে ময়লা, কাপড়ের এই জায়গা ওই ঘসটানিতে ফেঁসে গেছে।

বসন্তবাবু কোনরকমে লাঠিটা কুড়িয়ে ওদিকের লোকজনের ভিড়জমা ফুটপাথে উঠলেন। কী তীব্র অপমানে ওর দু'চোখ ফেটে জল নামে। ওই ছেলের দল জানে না, চেনে না অতীতের বসন্ত মজুমদারকে। এককালের বিপ্লবীদের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধেয় পরিচিত একটি মানুষ ছিলেন তিনি। ডিসিপ্লিন! ওই নিয়মানুবর্তিতাই আর ত্যাগ ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র। জীবনকেও তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্যে, আজ তারই এই প্রতিদান। চোখে জল ভরে আসে। ওই কর্মচারীদের শোভাযাত্রা চলেছে। ওদের অনেকেই ভালো মাইনে পায়, মাসকাবারি বন্দোবস্ত।

টেরিলিনের দামী পোষাক ওদের পরণে। পায়ে দামী জুতো। সমাজের মধ্যে তবু ওরা কিছুটা ভালো আছে, নিশ্চিন্ত আছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ওরা দল পাকিয়ে পথ রুদ্ধ করেছে। জাহির করছে নানা বড় বড় কথা। কিন্তু দেশের সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে তাদের কি ত্যাগ আর সাধনা আছে তা জানা নেই বসন্তবাবুর। ওরাও সেটা ভাবে নি।

হাঁটুটায় চোট লেগেছে, থেঁতলে গেছে। জ্বালা জ্বালা করছে। এই জ্বালাটা দেহের সীমানা ছাড়িয়ে মনের গভীরেও বেজেছে বসন্তবাবুর। লোকজন দেখেছে তাকে।

কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই এদের কৌতূহলী দৃষ্টির বাইরে সরে গিয়ে দাঁড়াতে চান। এ অপমান অসহ্য বোধ হয়। ধীরপায়ে এগিয়ে চলেন।

কার্জন পার্কের এদিকে গাড়িগুলো সারবন্দী আটকে আছে। বৈকালের দিকে বকমারি পশরা সাজিয়ে বসেছে দোকানীর দল। ফুচকা-দহিবড়া-চাটের খদ্দেরই বেশী।

বসন্তবাবু নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে একটু এগিয়ে এসে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তখনও উত্তেজনার ভাবটা কাটে নি। হাঁপাচ্ছেন। একটু দাঁড়িয়ে দম নিতে থাকেন। সামনেই ওই শহীদ মিনার। ওর নীচের মাঠে নানা বক্তৃতা—অনেক আশার কথা শোনানো হচ্ছে তারস্বরে তাও কানে আসে।

এক নেতা যে কথা বলেন,—আবার এই ময়দানেই সেই কথাগুলো পরে বদলে যায়। এই পালাবদল-রূপবদলের নীরব সাক্ষী ওই শহীদ মিনার। ওর স্তরে স্তরে কতো

বৈচিত্র্য জমে আছে। ও মৌন মূক হয়ে শুনছে এইসব কথাগুলো? দেখেছে সেই নাটকগুলোকে। একদিন হয়তো জেগে উঠবে আর প্রচণ্ড রাগে ফুঁসে উঠবে—মিথ্যার পর মিথ্যা সাজানো বাক্যের পুঞ্জীভূত উত্তাপে ফেটে পড়বে খান-খান হয়ে ওই আকাশছোঁয়া মিনারটা।

--মাস্টারমশাই। মাস্টারমশাই না।

কার ডাকে চমকে ওঠেন বসন্তবাবু। ওটা তার অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া নাম। বিক্রমপুর পরগণার পল্লীসবুজের স্নিগ্ধতার মাঝে ভিজে ঘাসফুলের গন্ধমাখা স্মৃতিজড়ানো একটি মুহূর্ত সহসা সজীব হয়ে ওঠে এই নিষ্ঠুর লোকারণ্য মহানগরীর হৃদয়হীন কাঠিন্যের মাঝে। তাই সচকিত হয়ে ফিরে চাইলেন বসন্তবাবু, এখানে ওই হারানো পরিচয়ে কে যেন তাকে ডাকছে। স্বপ্ন দেখছেন তিনি না এটা বাস্তব সত্য, তাই অবাক হয়ে দেখছেন বসন্তবাবু।

ওপাশে একটা ক্রিমকালার এ্যামবাসাডারের দরজা খুলে বের হয়ে আসছে একটি তরুণ। বলিষ্ঠ চেহারা; কপালের কাছে একটা কাটার চিহ্ন। ও কাছে এসে এসে শুধোলো বসন্তবাবুকে হালকা স্বরে।

—চিনতে পারছেন স্যার? আমি পটল। দীঘির পাড়ের-—

প্রণাম করার মত একটু ভঙ্গীতে মাথাও নোয়ালো। বসন্তবাবু এতক্ষণ অন্য জগতের বেদনাদায়ক চিন্তার গহনে তলিয়ে গেছলেন। স্মৃতিশক্তির ধারও কমে আসছে। তবু সব কেমন আবছা ভেসে আসে।

ছাত্রদের ভিড় কলরবটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে মনের সামনে।

এইবার যেন চেনা চেনা ঠেকে। হঠাৎ মনে পড়ে সেবার ফুটবল খেলার সময় ওই ছেলেটার কপালে চোট লেগেছিল স্কুলের মাঠে। তিনিই ওকে তুলে আনেন ডাক্তারখানায়। সেদিনের ছেলেটা আজ একটি সুন্দর যুবকে পরিণত হয়েছে, পরনে দামী সুট। চোকেমুখে উচ্ছ্বলতা।

বসন্তবাবু চিনেছেন ওকে, অনেক খুশীতে তাই বলে ওঠেন।

—পটলা! দীঘির পাড়ে মিত্তিদের বাড়ির পটল না?

—হ্যাঁ স্যার।

লিকলিকে পটলা আজ পুরোদস্তুর সাহেব সেজে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি হাঁকাচ্ছে। অথচ এই মিত্তিরদের বাড়ির হাল দেখেছিলেন তিনি তখন। পটলকে ধরে-

করে স্কুলে ফ্রিশিপের ব্যবস্থা করেছিলেন তার খেলাধূলা দেখে। আজ সে কত বদলে গেছে। তবু পটল চিনেছে তাকে।

পটল বলে।

—কতো দিন পর দেখা। সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল।

বসন্তবাবু শুধোন খুশীভরে।

—ভালো আছিস তো? খবর-সবর ভালো? কি করছিস?

ওকে 'তুই' তুই বলতে আজ দীন বসন্তবাবুর বাধে। পটল জানায় নম্রভাবে।

—চলছে কোনরকমে। চলুন—কতোদিন পরে দেখা, কথাবার্তা বলা যাবে। উঠুন গাড়িতে, আজ ছাড়ছি না স্যার।

বসন্তবাবুর খেয়াল হয় তার মাপা সময়। এই বয়সেও তাঁর সকাল সন্ধ্যায় দু'চারটে ছাত্রকে পড়াতে হয়। শরীরে সয় না, তবু উপায় নেই। না হলে সংসার অচল হয়ে যাবে।

ওই সব কাজের জন্য এখনও তার অবসর মেলে নি। মাঝে মাঝে পরীক্ষার আগে দুপুরবেলাতেও খাওয়া দাওয়া সেরে ছাত্রদের নিয়ে বসতে হয়। তখন মরশুমী ছাত্র কিছু আসে, আর বসন্তবাবুর সুনাম আছে যে তিনি অঘা-বঘা মার্কা ছেলেদের নিদেন তিন নম্বরেও উৎরে দেবার গুপ্তমন্ত্র কিছু জানেন। তাই সম্বল করে সংসার-সমুদ্রের টাল মাটাল তুফান পাড়ি দিয়ে চলেছেন এখনও। তাই বসন্তবাবু বলেন পটলকে।

—কিন্তু সন্ধ্যার পর যে আবার টুইশানি আছে বাবা।

পটল অবাক হয় ওঁর কথায়। সে জানায়।

—এখনও ওইসব কম্মো করতে হয়? রিটায়ার করেন নি? চলুন, ওসব হবে খন।

হাসলেন তিনি, বসন্তবাবুর মলিন বিষণ্ণ হাসিতে নীরব হতাশার বেদনাই ফুটে ওঠে। তাঁর জীবনে বিশ্রাম কোনদিনই মেলে নি। আজও তাঁর কোনো আশ্বাস নেই। বলেন তিনি।

—ঢেঁকি স্বগ্‌গে গেলেও ধানই ভানবে পটল। তাছাড়া সংসার চলবে কি করে? অমৃত বি-কম পাশ করল অনার্স নিয়ে, এখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। আর ছোট ছেলে অশোক এখন থেকেই পড়াশোনা ডকে তুলে নেতা হবার জন্য ঘুরছে। মেয়েটার বিয়ে-থাও দিতে পারলাম না। সব তো ছত্রভঙ্গ হয়ে রইল।

গাড়িটা মন্থরগতিতে এইবার চলেছে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে। এখানে ওই কলরব চীৎকার নেই। ময়দানের দিকের গাছ গাছালির বুকে আঁধার জমছে। ঐ পাশের আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোর চিকন নরম আলোর বর্ণালী ফুটে ওঠে।

এ কোন্ বিচিত্র জগৎ, জীবন এখানে অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। দৈন্য-দারিদ্র্যের ছোঁয়াটাকে ছাড়িয়ে মাটির মালিন্য এড়িয়ে ওরা আকাশে মাথা তুলেছে। নীচের তলার সঙ্গে সব সম্পর্ক এখানে অনুপস্থিত।

পটল চুপ করে কি ভাবছে। বসন্তবাবুর দিকে চাইল।

তখনও বসন্তবাবু বলে চলেছেন হতাশার সুরে।

—রজনীর কাছে গেছলাম। এককালে একসঙ্গে কাজ করেছি, এখন সে একজন কেউকেটা। ভাবলাম হয়তো মনে থাকবে আমার কথা, তাই গেছলাম ওর সঙ্গে দরখাস্ত একখানা নিয়ে দেখা করতে যদি একটা পেনসন-টেনশন করিয়ে দেয়।

পটল অবাক হয় এককালের সেই বিদ্রোহী তরুণকে এইভাবে দেখে। ওর মুখে-চোখে কি অসহায় মালিন্য ফুটে উঠেছে।

পটল এখন নিজের চেষ্টায় বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। এখন সমাজে তার নামডাক, মান-খাতিরও আছে। এখন ধুলোমুঠো ধরলে তা পটলের হাতে সোনামুঠো হয়ে আসে। মহানগরীতে সেও এসেছিল শূন্যহাতে, অনেক চেষ্টা করেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবার, কিন্তু পারে নি সেদিন।

হঠাৎ কোন রন্ধ্রপথে সে একটা রহস্যময় সমৃদ্ধ জগতের প্রবেশপথ আবিষ্কার করে ফেলে, তারপর থেকেই ধাপে ধাপে সে ভাগ্যের শিখরে উঠতে শুরু করেছে। পটল আজ পেয়েছে অনেক কিছু।

বসন্তবাবুর সঙ্গে, এইখানেই তার তফাৎ। তিনি হারিয়ে গেছেন আর তারই ছাত্র পটল আজ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বসন্তবাবু থেমে যান।

পটল শুধোয়—রজনীবাবু কি বললেন?

রজনীবাবুর আজকের ওই ব্যবহারটা তার প্রাণে বেজেছে। তবু সে সব কথা মুখ ফুটে জানাতে তিনি চান না। পটল বলে।

—শুনেছিলাম আপনার খুব চেনা-জানা লোক।

বসন্তবাবু মাথা নাড়েন মাত্র। পটলও তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে ওঁকে দেখছে—ওঁর

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে যে সেখানে কোনো কাজই হয় নি। বোধহয় রজনীবাবু ওকে পাত্তাই দেন নি। বসন্তবাবুর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সেটা বুঝেছে তবু যেন নিষ্ঠুর ভাবেই পটল বলে।

—তাহলে একটা গতি-ব্যবস্থা কিছু হবে? অমৃতকে বলুন না, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। উনি চেষ্টা করলে কিছু করে দিতে পারবেন।

বসন্তবাবু বিবর্ণ মুখে জানাবার চেষ্টা করেন সত্যটাকে গোপন রেখে।

—দেখি, তাই বলে।

গাড়িটা গাছ-গাছালির সবুজ ছায়া অন্ধকারভরা নির্জন রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সীমানায় ঢুকলো। গেটে আলো জ্বলছে। কাঁকরঢালা পথ, একদিকে সবুজ ঘাস-ঢাকা লনের পারে বাড়িটার নীচে এসে থামল।

বসন্তবাবু চারিদিকে চেয়ে দেখেন বিস্মিত চাহনি মেলে।

পটল বলে।

—আসুন মাস্টারমশাই, ভিতরে আসুন। একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি।

বসন্তবাবু ড্রয়িংরুমে ঢুকে অবাক হয়ে দেখছেন।

হঠাৎ বসন্তবাবুর খেয়াল হয়। তিনি বলেন। ওদিকে টুইশানিতে যেতে হবে বাবা বেশী দেরী হলে মুস্কিল হবে।

পটল বলে। এখান থেকে গাড়ি পৌঁছে দেবে আপনাকে। ভয় নেই।

হঠাৎ প্রশ্ন করে পটল। কতো পান এখানে মাস্টারমশাই? ওই সব টুইশানি করে।

বসন্তবাবু ওর প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে যান। কি ভেবে জানান।

—চল্লিশ টাকা দেয় ওরা।

বেয়ারা এর মধ্যে দামী কফিসেটে ঢাকনা দিয়ে কফিপট এনে হাজির করেছে। প্লেটে সাজানো রয়েছে দুটো বড় সন্দেশ। কিছু ক্যাজুনাট।

—নিন, মাস্টারমশাই।

বসন্তবাবুর খিদেও পেয়েছিল। বৈকালে টিফিন জোটে না। বড়জোর এককাপ জলো সস্তা গন্ধওয়ালা ভ্যাপসা চা নামক তরল পদার্থ গিলে ছাত্র পড়াতে বের হন বাড়ি থেকে।

আজ দুপুরে একমুঠো কড়কড়ে ভাত আর ওই কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে ঘোরাঘুরি

করেছেন। খিদেটা তীব্র হয়ে উঠছে। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সেই লালসা আর বুভুক্ষার ছায়া। পটলের কাছে ওটা খুব চেনা। এইটুকু বুভুক্ষাকে নিয়ে তার বেসাতি।

পটল দেখছে ওই মানুষটাকে। বসন্তবাবু সন্দেশটা গোগ্রাসে গিলছেন।

সাবিত্রী সেলাই-এব স্কুলে এসে দরজা-জানালা খুলে কুঁজোতে জল পুরে কাজ শুরু করে। গার্লস স্কুলের ওপাশে ক'খানা ঘর নিয়ে সেলাই-এর ক্লাশ আর গানের ক্লাশ বসে উপরের তলায়।

সাবিত্রী বড়দিদিমণিকে ধরে-করে কোনমতে এই কাজটা পেয়েছে। তবু মাস গেলে কিছু টাকা মাইনে পায়। নিজের হাতখরচটা শাড়ি-জমাটাও কিনতে পারে। তাছাড়া বাড়ির যা অবস্থা তাতে বসে খাওয়া চলে না। তার মনেও এককালে আশা ছিল গান শিখবে।

আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

এখন ক্লাশ চালু হয় নি। ঘর ঝাঁট দিয়ে যায় জমাদার। সাবিত্রীর তদারকিতে সে হারমোনিয়াম, তবলা-তানপুরা বের করে রাখে।

নীচে সেলাই শিক্ষালয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সাবিত্রী এই ফাঁকে উপরের ঘরে এসে ওই যন্ত্রগুলোর দিকে চেয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে হারমোনিয়ামে সুর তোলে।

ওই সুরটা যেন তার চেনা।

কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণে ওই সুর হঠাৎ তার মন থেকে কি বেদনায় হারিয়ে গেছে।

আর একজনের কথা মনে পড়ে।

কাজল। আজ সে নামকরা গাইয়ে। একদিন অতীতে কাজল ছিল ওদের ওই বাড়িটায়।

কাজলই বলতো ওকে।

—সুন্দর গলা তোমার।

—ছাই! সাবিত্রী মনে মনে খুশী হলেও মুখে সে ভাবটা আনতো না। কাজল গাইতো।

সুরটা এখনও ভোলে নি সে।

বহু বেদনায় নীল দিনগুলোর আড়ালে কবে তার মনে এসেছিল একটি আবেশ, সেই কথা আজও ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করে সাবিত্রী।

কাজল আজ অনেক উপরে।

হয়তো তাকে ভুলে গেছে। কোথায় একটা গানের আসরে কাজল গাইছিল, সাবিত্রীর খুব ইচ্ছে হয়েছিল গান শুনতে। তাকে দেখতে যাবে। কিন্তু টিকিটের দাম যোগাবার পয়সা তার ছিল না।

তাই পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছিল। ওরা অনেক দূরের মানুষ। সাবিত্রীর কাছে সব স্বপ্ন ভালোবাসার সুর বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছে।

আজ তার নিজের খরচ চালাবার জন্য একটা সেলাই আর গানের স্কুলে এই আধা ঝিগিরির কাজ নিতে হয়েছে।

তবু এই থেকে নিজের সামান্য সখসাধও কোনমতে মেটাতে পারে। দু'একদিন সিনেমাও দেখে। দায়ে-অদায়ে সংসারে রেশন বাজারেও কিছু দিতে পারে। প্রথম প্রথম নিজের খারাপ লাগতো। হাজার হোক কাজটা খুব সম্মানের নয়। বিশেষ করে দু'চারজন ছাত্রী আছে তারা তো ওকে যেন ঝি বলেই ভাবে। এই অবজ্ঞাটা সহ্য করতে পারতো না। এখন সয়ে গেছে।

রূপ সাবিত্রীরও আছে, তবে গরীব সে। জানে তাকে এখানে কাজ করে নিজের দিন চালাতে হয়। আর সেই ভাবনাটাই তার মনে যে ক্লিষ্ট ভাবনা আনে তারই মালিন্য কিছুটা ফুটে উঠেছে তার মুখে। সেই রূপ-যৌবনের দীপ্তিকে শাণ-পালিশ দিয়ে ওদের মত উদগ্র করে তোলার সাধ্য তার নেই।

---সাবিত্রী।

ছোটদিদিমণি সুলেখা তাকে ডাকছে। ওদিকের ঘরে গানের ক্লাশ বসেছে। নীচের ঘর থেকে সেলাইকলের মৃদু একটানা কর্কশ শব্দটা ওঠে।

ওই গানের সুরে সঙ্গে সেলাইকলের শব্দটাকে মাঝে মাঝে তুলনা করেছে সাবিত্রী। তাতে মনে হয়েছে ওই সেলাইকলের শব্দটা যেন একটা আর্তনাদ। ওখানে যারা কাজ শিখতে আসে তাদের অনেকেরই মুখে ফুটে উঠেছে অভাব দৈন্যের ছায়া, শুধু বাঁচার তাগিদেই এসেছে এখানে সেলাই শিখে তবু কিছু আসবে।

আর গানের স্কুলের মেয়েদের তাদের তুলনায় অনেক সুন্দরী -প্রাণ-উছল বলেই মনে হয়। এরা অনেক সুখী।

সাবিত্রী খাতাখানা নিয়ে ছোটদিদিমণির গানের ক্লাশে গিয়ে ঢুকল। সুলেখাদি বেশ নামকরা গাইয়ে, রেকর্ডও আছে। রেডিওতে মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম করেন।

মেয়েরাও এসে গেছে ক্লাশে। তবলচী হারমোনিয়াম তানপুরার সুর মিলিয়ে তবলা বাঁধছে। সাবিত্রীর কানে ওই সুরটা কি যেন আবেশ আনে। সাবিত্রীরও ইচ্ছে করে গানটা সেও আবার শিখবে। বাবার চাকরীতে থাকার সময় সাবিত্রী গান শিখেছিল। বাবা একটা পুরোনো হারমোনিয়ামও কিনে দিয়েছিলেন সেটাও খারাপ হয়ে ধূলো জমে পড়ে আছে। কাজলরা ওখানে থাকতে সাবিত্রীও গান গাইতো। কাজলের সুর ওই বাড়িতে প্রাণের আবেশ এনেছিল। আজ ওখানে শুধু হাহাকার আর যন্ত্রণা। ওই হতদরিদ্র মানুষগুলোর জগতে সুর ওঠে না—সব সুর সেখানে আর্তনাদ হয়ে ওঠে। সুলেখাও লক্ষ্য করেছে সাবিত্রীকে কিছুদিন ধরে। মেয়েটি অবস্থার চাপে পড়ে এখানে সামান্য মাইনেতে এই কাজ করতে এসেছে। মুখচোখে এখনও রয়ে গেছে ভদ্রঘরের সলজ্জ নম্রতার ছায়া। ওর দু'চোখে একটু বিচিত্র স্বপ্নের আভাস ফুটে উঠেছে ওই সুরের ছোঁয়ায়।

সুলেখা দেখেছে সাবিত্রীকে গানের ফাঁকে ফাঁকে।

সাবিত্রী ওই গানের ভাষাগুলো জানে।

—আমি চঞ্চল হে—

এ গানও সে গাইত, সেই সুখশান্তির দিনগুলোর স্মৃতি মিশিয়ে আছে ওই সুরে। আরও কার কথা মনে পড়ে। তাদের পাশের ঘরে থাকতো তখন কাজলবাবুরা। কাজলবাবু তখন সবে গান গেয়ে নাম করছে। দরাজ ভরাটি গলা তাজা তরুণ কাজল মুখার্জি দরাজ প্রাণখোলা আবেগে হাসতো।

মা আর ছেলের সংসার। মাও মাঝে মাঝে বাধা দিতো।

—এ্যাই কাজল দিনরাত প্যাঁ-পুঁ চীৎকার দিয়ে তো বাড়ির লোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছিস, পড়াশোনা গোল্লায় গেছে, আবার ওই হেঁড়ে গলায় ঠা-ঠা করে হাসির তুফান তুলবি যখন-তখন?

সাবিত্রীও এসে জমতো এঘরে; ও-ও কাজলকে রাগাবার জন্য বলতো।

—ঠিক বলেছো মাসীমা।

কাজলদা বলতো।

—তবু ঝিমিয়ে পড়া বাড়িটাকে—এ বাড়ির মানুষগুলোকে নাড়া দিতে চাই মা। এরা যেন সব মরে গেছে।

সাবিত্রীও বলতো—আর তুমি একা বেঁচে আছো? কাজল তবু গান গাইতো।

কাজলের মা এটাকে খুশি মনে নিতে পারতেন না। বলতেন।

—থাক। আর জ্বালাসনে বাবা।

সাবিত্রীর মনের আকাশে সেই সুরের আলো আজও রয়ে গেছে। ওই ভাষা, বাণী আর সুর তার মনকে আজকের কঠিন পরিবেশের বাইরে সেই বেদনাবিধুর আনন্দস্পর্শময় একটি স্বপ্নজগতে নিয়ে গেছে।

কাজলবাবু আজ নামকরা গাইয়ে। রেকর্ড-রেডিও-সিনেমার প্লেব্যাক করছেন। বালিগঞ্জের কোথাও উঠে গেছেন ক'বছর আগে তিলজলার সেই এঁদো বাড়িটা থেকে। আর লক্ষ্য করেছে সাবিত্রী সেই দিন থেকেই ওই বাড়ির প্রাণস্পন্দনটুকুও যেন থেমে গেছে। সুর মুছে গেছে।

—সাবিত্রী। সা-বি-ত্রী।

কর্কশ বেসুরো গলার বিকট চিৎকারের রেশ এই সুরের জগতকে কি কাঠিন্যে ভরে তুলেছে। সেলাইঘরের দিদিমণি ডাকচে তাকে। নীচের ঘর থেকে খ্যানখ্যানে গলা তুলে।

সাবিত্রী বের হয়ে গেল কোণ থেকে উঠে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

সুলেখা লক্ষ্য করছিল সাবিত্রীকে, মেয়েটা সুরের মায়ায় আটকে পড়েছে। তালে তালে মাথা নাড়ছিল, হঠাৎ কর্কশ স্বরে চমকে উঠে চলে গেল সন্তর্পণে এঘরের দরজাটা বন্ধ করে।

—কোথায় থাকিস? ডেকে-হেঁকে পাত্তা মেলে না?

সেলাইঘরের বড়দি তর্জন গর্জন করে ওঠে।

মেশিনের বিশ্রী ঘটঘট শব্দ উঠছে। ওদিকে কাঁচি দিয়ে টেবিলের উপর দু'জন শুকনো চিমড়ে চেহারার মেয়ে কাপড় থেকে কি ছাঁটাই করছিল, লক্ষ্মী বলে সবিত্রীকে ঢুকতে দেখে।

—ওকে আর পাবে কোথায় সরলাদি, সাবিত্রীর কাছে এসব ভালো লাগবে কেন? গানের ঘরের ছোকরা তবলচী—ওকেই দেখছিল হাঁ করে।

সাবিত্রী কি লজ্জায় রাগে জ্বলে ওঠে। প্রতিবাদ করে সে—কি বলছো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদির শুকনো তোবড়ানো মুখে কি একটা হাসির আভাস জাগে—সাবিত্রী জানে স্বামীর সঙ্গে লক্ষ্মীদির কোনো সম্পর্ক নেই। একাই থাকে এ'পাড়ার দিকে একটা ঘর নিয়ে আর টুকটাক সেলাই-এর কাজ করে দিন চালায়। কর্কশ মুখরা মেয়ে—চেহারাটাও পাকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে, তবু জিবের ধার যায় নি।

সেলাইদিদিমণি সরলাকে লক্ষ্মী ওই কথাগুলো শুনিয়ে আর একটা বিশ্রী কল্পনা করে খানিকটা আনন্দ পাচ্ছে। ওর ব্যর্থ বঞ্চিত মন সেই জৈবিক তৃপ্তিটা পেতে চায়—এইভাবেই আক্রমণ করে।

লক্ষ্মীদি বলে।

—চোখ-কান তো আছে। দেখতেও পাই—শুনতেও পাই। তা লজ্জা কিসের? সোমত্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এক-আধটু এমন হয়। তবে হ্যাঁ—যেন বাড়াবাড়িটা না ঘটে। সামলে থাকবি।

সেলাইঘরের মেয়েরা অনেকে মুখ টিপে—কেউ ফিকফিক্ করে হাসছে। এই বিশ্রী কথাগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। দুঃসহ লজ্জায় সাবিত্রীর মাথা নুইয়ে আসে।

সেলাইঘরের বড়দিদিমণি সরলা মুখখানা বুলডগের মত ভারী করে বলে।

—এসব কথা যেন আর না শুনি সাবিত্রী। মেয়েদের ইস্কুল ওসব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে থাকলে জবাব দিতে হবে তোমাকে।

লক্ষ্মীদি হাসছে।

এ চাকরীটারও দরকার সাবিত্রীর, এই ঝিগিরিও তার কাছে ফ্যালনা নয়।

তাই সাবিত্রী আর্তকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে সরলাকে।

—বিশ্বাস করুণ দিদিমণি, ওসব মিথ্যে কথা।

সরলা ওর দিকে চাইল।

সাবিত্রী জানে লক্ষ্মীদির দু'একটা ঘটনা। ও-পাড়ায় তার দু'-একজন বান্ধবী আছে তাদের কাছেই শুনেছে কোন এক আধবুড়ো দোকানদারের সঙ্গে লক্ষ্মীদির ভাবসাবের কথা। তাই নিয়ে পাড়ার ছেলেরাও হামলা করেছিল তার দোকানে। সেই লক্ষ্মীদিকে তার সম্বন্ধে একথা বলতে দেখে অবাক হয়।

সাবিত্রী সে সব নোংরা কথা বলতে পারে না। তবু নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্যই প্রতিবাদ করে সে। সরলাদি সাবধান করে দেয় সাবিত্রীকে।

এবারের মত ছেড়ে দিলাম, আর যেন এসব কথা না শুনি। যাও চা নিয়ে এসো।

সাবিত্রী একটু বিব্রত বোধ করে।

সাবিত্রীর এই চা আনার কাজটা বিশ্রী লাগে। রাস্তার ওদিকের চায়ের দোকানে এই এলাকার কিছু ছেলের দল আড্ডা জমায় সর্বক্ষণ। তাদের দু'-একজন ওকে কেটলি হাতে চায়ের জন্য গিয়ে দাঁড়ালে মন্তব্য করে জোর গলায়।

—কমণ্ডলু হাতে যোগিনীর প্রবেশ। দাও গুপীদা, অমৃত দাও এবার।

সাহসী দু'-একজন সরাসরিই শুধোয় সাবিত্রীকে একটু কাছে এসে।

—এখানে কতো করে মাইনে পাও, ওই সেলাই গান-ফানের ইস্কুলে?

সাবিত্রী ওদের এড়াবার চেষ্টা করেছিল প্রথম দিকে। দোকানে পয়সা দিয়ে চা নিয়ে চলে এসেছে ওদের কথার জবাব না দিয়ে। যেন শুনতেই পায় নি ওদের কথা।

ছেলেদের কে বলে—বোবা-টোবা নয়তো র‍্যা?

অন্যজন শোনায়।

—হাবা-গোবা? চোক দেখছিস না? যেন চাক্কু মারতে আসছে। লাটখান মন্দ লয়।

ছেলেরাও দোকানে ওর জন্য ওৎ পেতে থাকতো। সাবিত্রীর ভালো লাগতো না চা আনতে যেতে, এখানেও কিছু বলতে পারতো না।

ক্রমশ ছেলেদের গানও বের হতো ওকে দেখলে। কে বলে একদিন ওকে।

—কতো দিন পথ চেয়ে থাকবো মাইরী?

সাবিত্রীও রুখে দাঁড়িয়েছিল ওদের ওই কথায়। তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে সাবিত্রী ছেলেটিকে।

—কি বললেন? আপনারা না ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা ছেলে। একজন মেয়ের সম্বন্ধে এই সব বাজে কথা বলতে এতটুকু বাধে না?

ছেলেটাও বাধা পেয়ে হকচকিয়ে গেছে, ও ভাবে নি সাবিত্রী এমনিভাবে প্রতিবাদ করবে।

সরে গিয়েছিল সে। সাবিত্রীও চলে আসে। তবু খারাপ লাগে নি তার। কিছু ছেলের মনেও সাড়া তুলেছে সে।

ছেলের দল বলে।

—এ যে চড়া সুরে গায় র‍্যা?—তাই দেখছি। খাম্বাজ রাগিনী বাবা।

সেই থেকে ওই নামেই ওকে ডাকে তারা। সাবিত্রী শুনেছে ওর সম্বন্ধে নানা মন্তব্য। তাই চা আনতে ভালো লাগে না তার।

আজ তবু মনে হয় এই মেয়েদের তুলনায় তারা অনেক ভালো। একটু প্রেম জানাবার চেষ্টা করা মাত্র, কিন্তু লক্ষ্মীদিরা? বিষধর সাপের মত বিষ-ছোবল মারার জন্য উদ্যত হয়ে আছে।

সাবিত্রীকে চাকরীটা রাখতে হবে। তাই চায়ের কেটলি হাতে করেই নেমে গেল রাস্তায়।

ওপাশের ঘর থেকে মেয়েদের সেই গানের সুর ভেসে আসে। সুলেখাদির মিষ্টি গলাটা ওদের সকলের সুরের আকাশে যেন ডানা মেলা পাখীর মতই স্বচ্ছন্দ গতিতে ভেসে ভেসে চলেছে কোন নির্জন ছায়াবন ঘেরা দিগন্তের ইঙ্গিত নিয়ে।

রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়—

বনমর্মরে ছায়ার খেলায়।

এই ভাবজগতে লক্ষ্মীদির নোংরা মন্তব্যের ঠাঁই নেই, সেলাইঘরের বড়দিদিমণি সরলাদির কঠিন শাসানি নেই। একটি স্মৃতি সুরভিমুখর জগতে একটি কুমারীমন শুচিস্নাত পরিবেশে কোন কল্পনাতীত জগৎকে যেন প্রত্যক্ষ করেছে তার সব অধরা রূপ রস বর্ণ গন্ধের উপস্থিতিতে।

চা নিয়ে ফিরছে সাবিত্রী দোকান থেকে।

তাদের স্কুলের কাছে হঠাৎ একটা ট্যাক্সি থামতে দেখে দাঁড়াল সাবিত্রী। গানের স্কুলের ছাত্রীদের অনেকেই মাঝে মাঝে ট্যাক্সিতে না হয় বাড়ির গাড়িতে আসা-যাওয়া করে। গানের স্কুলের ছাত্রীসংখ্যাই বেশী। নামকরা গাইয়েরাও অনেকে আসেন। তাদের আসছে বোধহয়।

সাবিত্রী কেটলিতে চা নিয়ে ঢুকছিল ওদিকের দরজা দিয়ে, দাঁড়িয়েছে থমকে।

হঠাৎ অবাক হয় সে, হাত-পা ঝিমঝিম করছে। পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে ওর। কেমন বিভ্রান্ত চাহনিতে দেখছে কাকে।

ট্যাক্সি থেকে নামল একটি তরুণ, পরনে গরদের পাঞ্জাবী, দামী কাঁচি ধুতির কোঁচাটা মাটিতে ঠেকছে, পায়ে সাদা কাজ-করা স্লিপার, চোখে কালো চশমা পরে নিজের পরিচয়টাকে কিছুটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেছে।

সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ট্যাক্সি থেকে নেমে কোন দিকে না চেয়ে উপরে উঠে গেল। ওর চাল-চলনে একটা ব্যাক্তিত্বের ছাপ ফুটে ওঠে।

হাতের চা-ভর্তি গরম কেটলিটা যেন চলকে পড়বে। সাবিত্রী রেলিংটা ধরে সামলে নিল কোনমতে।

ওই তরুণটিকে সে চেনে, আজকের তার এই দৈন্যদশা আর কেটলি হাতে চা কিনে আনার চাকরীর পরিচয় সে দিতে পারে না কাজলদার কাছে। তাই সরে এল সাবিত্রী।

আজকের নামকরা সঙ্গীতশিল্পী কাজল মুখার্জী তাকে চেনে না বোধ হয়। সাবিত্রীর মনে হয় সমাজ সংসার সবই একটা চাকার মত গতি নিয়ে ঘুরছে। আর সেই উপর-নীচুর গতিবেগে একদিন তারা ছিটকে পড়েছে। অতীতে দু'জনে একসঙ্গেই ছিল। হয়তো ভালো লেগেছিল কাজলের সেদিনের সেই সহজ জীবনযাত্রা-পথের একটি সাধারণ মেয়েকে।

আজ কাজল সেই চাকার তালে তালে সমাজের অনেক উপরতলায় উঠে গেছে, সেখান থেকে নীচের দিকে নজর চলে না। দেখা যায় শুধু অন্ধকার একটা অতলান্ত গহ্বরকে।

সাবিত্রী সেই অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন অতলে হারিয়ে গেছে। অতীতের সব পরিচয় মিথ্যা আর বিস্মৃত বেদনায় পরিণত হয়েছে। চা এনে সরলাদির কাপে ঢেলে রাখলো।

সরলাদি চায়ে চুমুক দিয়েই ফুঁসিয়ে ওঠে সাবিত্রীকে।

—ঠাণ্ডা জল করে এনেছো? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

চায়ের মৌতাত বিগড়ে যেতে ওদের মেজাজও বিষিয়ে গেছে। অন্য শিক্ষিকা যমুনাদিও বলে।

—চায়ের দোকানের ছেলেগুলোর সঙ্গে দেখি কি কথাবার্তা বলো চা আনতে গিয়ে?

সাবিত্রী সেদিন ওদের ধমক দিয়েছিল, আর সেটাই যমুনাদির নজরে পড়েছিল, যমুনাদিও হয়তো কিছু ভেবেছিল। আজ সেই ইঙ্গিত করে। ওরা সকলেই কথাটা বেশ উপভোগ করছে।

সাবিত্রীর আজ একটু দেরী হয়েছে চা নিয়ে ফিরতে। ছেলেরা কেউ আজ তাকে বিব্রত করে নি। একটা যেন নীরব সন্ধি করেছে তারা। দেরী হয়েছিল অন্য কারণে।

সাবিত্রী আজ এই ট্যাক্সি থেকে কাজলদাকে নামতে দেখে কেমন থেমে গিয়েছিল। আড়ালে সরে গিয়েছিল। দেরী তার ওরই জন্য। তাই চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অন্যভাবে কথাটা বলে সাবিত্রী।

—ভাঙানি ছিল না দোকানে তাই দেরী হয়ে গেল। এখন নাকি ভাঙানি মিলছে না কোথাও।

সরলাদি ওকে দেখেছে।

লক্ষ্মীদি বলে।

—আর সেই অবসরে একটু—

—তাই নাকি?

হাসছে সকলেই।

সাবিত্রীর মনে হয়, ওর সারা গায়ে ওরা চাবুকের ঘা বসিয়ে চলেছে নিষ্ঠুরভাবে। মুখ বুজে তবু সব সইতে হবে তাকে। চুপ করে সাবিত্রী সরে এল। সিঁড়ির নীচে একটা টুলে তার বসার ঠাঁই। সেখানের প্রায়ান্ধকার ঠাঁইটায় চুপ করে বসে কি ভাবছে সে! লজ্জায় অপমানে চোখ জলে ভরে আসে।

সুরটা উঠছে। কাজলদা'র গলা তার খুব চেনা। ওই সুরে মিশিয়ে আছে কতো স্মৃতি।

বোধহয় কাজলবাবুও এই গানের স্কুলে সপ্তাহে একদিন করে ক্লাশ করতে আসবেন। ওর নাম শুনলেই আজ থেকে অনেক ছাত্রী আসছে ভর্তি হতে। স্কুল জমে উঠছে।

সাবিত্রীর ভয় হয় একদিন তাকে দেখবে কাজলদা এখানে এই ঝিগিরি করতে। সেদিন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে সাবিত্রী।

কিন্তু মনের সেই ভয়টাকেও তাকে জয় করতে হবে। বাঁচতে হবে তাকে। এই অপমান এই লাঞ্ছনা সয়েও তাকে বাঁচতে হবে। এই সম্মানবোধ তার কাছে আজ অর্থহীন হয়ে গেছে।

অভাব আর বেঁচে থাকার জন্যেই তাকেও সব বিসর্জন দিতে হবে। সেই বোধটাই সাবিত্রীকে যেন আরও কঠিন সহনশীল করে তুলেছে। সুরটা তাকে আনমনা করে তোলে।

নেমপ্লেটটা এককালে বেশী সুদৃশ্য ছিল আর আভিজাত্যের পরিচয়ই বহন করতো।

এখন সেটা বিবর্ণ, অক্ষরগুলো ঠিক বোঝা যায় না দূর থেকে। দু'-একটা প্লাস্টিকের টাইপ খুলে গেছে। চুণবালি খসা বিবর্ণ দেওয়ালে ওই নেমপ্লেটটা লাগানো আছে কোনমতে। পাশে একটা লেটারবক্স, তারও তেমনি দৈন্যদশা। আর কলিংবেল রয়েছে। কিন্তু সেটা বোধহয় বাজে না, কানেকশন নেই। সব ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

অমৃত খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যার পর এদিকে এসে এখানে ঠেক্ খেয়েছে। ছাত্র পড়াতেই এসেছিল। ওদিকেই তার ছাত্রের বাড়ি। কিন্তু ছাত্র আজ কোন আত্মীয়ের ওখানে গেছে—তাই অবসর মিলেছে অমৃতের।

বেলটা টিপেও কোন সাড়া মেলে না। ওটা বোধহয় অচল হয়ে গেছে।

শেষকালে সনাতনী ডাকের পন্থা কড়া নাড়ানো, তাই শুরু করতে কে যেন ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে বলে বোধ হয়। অমৃত একটু থামলো।

দরজাটা খুলেছেন লম্বা সিটকে মত এক ভদ্রলোক। এককালে হয়তো স্বাস্থ্য ভালোই ছিল, এখন শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গেছে। গাল দুটো তোবড়ানো। চোখে-মুখে কালচে একটু আভাস। শীর্ণ মুখে বড় একটা চুরুট ধরানো, ওর গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন। তার আসল রংটা এখন বোঝার উপায় নেই। কালচে বিবর্ণ হয়ে গেছে সেটা। চুরুটের চিমসে গন্ধ ওঠে।

ভদ্রলোক অমৃতকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখছেন, অমৃতও ঘাবড়ে গেছে একটু ওই চাহনির সামনে।

এখানে আসতে ঠিক চায় নি। এই পথ দিয়েই যাচ্ছিল, হঠাৎ নম্বরটা দেখে দোতলার এই ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে সে। মাত্র ক'দিনের মুখচেনা ওই মেয়েটি, আর যে পরিচয় হয়েছিল পথে ওই ঘটনার মাধ্যমে তার জের টেনে এখানে আসাটায় বিশেষত কোন জোরদার যুক্তি খুঁজে পায় না অমৃত। তবু শুধোয় অমৃত।

—এটা তিন নম্বর ফ্ল্যাট?

ওর প্রশ্নে একটু কড়াস্বরে ভদ্রলোক শুধোন।

—হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

ভদ্রলোক ইংরাজীতেই কথা বলায় অভ্যস্ত তাই দেখাতে চান। অমৃত সেই ইতি-উতি ভাবটা কাটিয়ে জানায়।

—এখানে রাত্রি—মিস রাত্রি চৌধুরী থাকেন, তার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। মানে তিনিই আসতে বলেছিলেন।

ওর কথাবার্তার শব্দটা ভিতরেও গেছে বোধহয়। ওদিককার বারান্দায় কার পায়ের ব্যস্ত শব্দ শোনা যায়। ভদ্রলোক চুরুট মুখেই শুধোন এবার।

—বেবীকে খুঁজছো তুমি?

বেবীই বোধহয় ওই মেয়েটির ডাকনাম। অমৃত তাই আন্দাজেই ঘাড় নাড়ে—আজ্ঞে।

—ওমা। আপনি!

পিছনে নাটকীয়ভাবে আবির্ভূত হ'ল রাত্রি। অমৃতকে সেও দেখেছে। তাই বলে।

—এর কথাই বলছিলাম ড্যাডি। কি বিশ্রী অবস্থায় পড়েছিলাম, উনি খুব 'সেভ' করেছিলেন সিচুয়েশনটা। আসুন ভেতরে আসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

ভদ্রলোকের শুকনো মুখটার রেখাগুলো নরম হয়ে আসে। তিনিও একটু নিমরাজী হয়েই বলেন।

—কাম্ ইন্।

অমৃত বাধ্য হয়েই ভিতরে গেল। ভদ্রলোক দরজাটা বন্ধ করে এগিয়ে গিয়ে বলেন কুণ্ঠিত স্বরে অমৃতকে।

—প্লিজ সিট ডাউন।

ভদ্রলোক ড্রইংরুমে পায়চারী করতে থাকেন। ড্রইং রুমই বলা হোত এককালে। এখন সারা ঘরে ফুটে উঠেছে একটা দৈন্যদশা। মেজের জুট ম্যাটিং ছিঁড়ে গেছে। পর্দাগুলোও দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে জালি জালি হয়ে গেছে, সোফাসেট একটা আছে, তার গদি ফেটে তুলো বের হচ্ছে, কোনরকমে পুরোনো বিছানার চাদর ঢেকে ইজ্জৎ রক্ষা করা হয়েছে। দেওয়ালে কয়েকটা মলিন বিবর্ণ ফটোগ্রাফ টাঙ্গানো। সেগুলো ভালো করে দেখলে আবছা চেনা যায় ওই ভদ্রলোকের যৌবন—মাঝবয়সের ছবি বলে। স্যুট পরা ঋজু চেহারা, হাতে হ্যাট। আশপাশের লোকগুলোও ওই ধড়াচূড়া চাপিয়ে সাহেব সাজার চেষ্টা করেছে, আর কারোও মুখে হাসি নেই। ফটো তুলছি ভেবে মুখ বোদা করে বৃষকাষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমৃত ওই ছবিগুলো দেখতে থাকে।

ভদ্রলোক এবার যেন কথা বলার মত কিছু পান।

এতক্ষণ অমৃতও দেখেছে ভদ্রলোক যেন বন্দী সিংহের মত গাম্ভীর্য নিয়ে পায়চারী করছিলেন। এবার কাছে এসে তিনি বলেন অমৃতকে।

—ওই ছবিটা দেখেছো? আমি তখন জলপাইগুড়ির ফার্স্ট মুনসেফ। ফেয়ারওয়েলের ছবি। ওটা দেখছো মেদিনীপুরের সাব ডিভিশনাল হেড হয়ে যাবার সময়ের রিসেপশনের ছবি। ওপাশে ইন দি চেয়ার রয়েছেন মিঃ লকহার্ট, খাস্ বিলেতী সাহেব। এ ম্যান অব আইডিয়াজ।

অমৃত ঘাড় নাড়ছে।

রাত্রি এর মধ্যে ফিরে এসে পরিচয় করিয়ে দেয় ওর বাবার সঙ্গে অমৃতের।

—আমার বাবা। রিটায়ার্ড গেজেটেড অফিসার। আর ড্যাডি—ইনি অমৃতবাবু। অনার্স নিয়ে পাশ করেছেন—কমার্সের ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র।

হাসল অমৃত। ওই পরিচয়টা আজ ব্যঙ্গের। সে জানায়।

—বর্তমানে বেকার।

অসিতবাবু চুরুটে দীর্ঘ টান দিয়ে বলেন একটু থমথমে স্বরে।

—আমাদের আমলে এসব ছিল না। তখন ব্রাইট ইয়ং বয়েজদের জন্য ছিল গোল্ডেন কেরিয়ার। আমিই কেরিয়ার স্টার্ট করেছিলাম এ্যাজ এ ক্লার্ক এণ্ড রোজ আপটু ক্লাস ওয়ান গেজেটেড। বুঝলে ইয়ংম্যান আজকের দিনের ছেলেদের সেই সাধনা নেই। আর ওপরের তলার লোকদের নেই নিষ্ঠা। সব তাই ভেঙ্গে পড়ছে।

রাত্রি বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

অমৃত চুপ করে ওঁর কথা শুনে চলেছে। রাত্রি বাবাকে থামাবার চেষ্টা করে। জানে বাবা এইবার কথা শুরু করবে আর তাকে থামানো যাবে না। তাই বলে।

—ড্যাডি তোমার ওষুধটা খাবার টাইম হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক একা থেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন।

—হোক। বুঝলে অমৃত, তুমি বলেই ডাকছি কিন্তু, আমার আবার দীর্ঘদিন ওই সব পোস্টে থাকার ফলে 'তুমি' বলাই স্বভাব হয়ে গেছে।

অমৃতও দেখেছে রাত্রির কুণ্ঠিত ভাবটা। তার এই সংশয় কাটাবার জন্যেই বলে ওঠে অমৃত।

—না, না। তুমিই বলবেন আমাকে।

—দ্যাটস্ লাইক্ এ গুড বয়। হ্যাঁ, সেদিন আমি ছিলাম অনেকের কাছে টেরার। দুঁদে অফিসার। আর ছেলেরা যারা তখন স্বদেশী করতো। অসিত দত্তের নাম শুনলে,

সেই বাঘা টেরারিস্টেরও বুক কাঁপতো। বুঝলে? সেবার রংপুর জেলার সব আন্দোলনকে এই দত্তসাহেবই ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন।

অমৃতের মনে হয় ভদ্রলোকের মনে অতীতের ছবিটাই আজও সত্য হয়ে আছে, তার কারণও ওর জানা হয়ে গেছে।

অর্থাৎ বর্তমানের কোন উজ্জ্বল আশা তার মনের কোণে কোথাও জেগে নেই। বর্তমানে তিনি কোনো আশ্বাসই পান নি। অমৃতও দেখেছে রাত্রির অবস্থাটা। না হলে চাকরীর জন্যে ওকে বের হতে হতো না। ভদ্রলোক আজ হতাশ হয়েছেন বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। বর্তমানে যা আছে তা অন্ধকারের নিবিড় ছায়া মাত্র। তাই বর্তমানের থেকে অতীতের দিনগুলোর স্মৃতিই তাঁর মনে ঠাঁই পেয়েছে।

রাত্রি অমৃতের দিকে চাইল। রাত্রির নিজেরই লজ্জা করে বাবার এই সব নিষ্ফল তর্জন-গর্জনের কথা শুনে। ওর পোশাক-আশাকও তেমনি। আগেকার সব সমৃদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেছে।

রাত্রিরও চাকরী নেই, বাবার পেন্সনের টাকায় এই সংসারের চাকাটা কোনমতে চলেছে, তাতে ঠাট-বাট বজায় রেখে চলে না। যেন ঠ্যাসানির চোটে দেওয়ালে এসে পিঠ ঠেকেছে। চারিদিকে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

অসিতবাবুর খেয়াল হয়। বলেন তিনি।

—অমৃতের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।

আবার গল্পের খেই ধরেন তিনি।

তখনকার দিনগুলোই ছিল ভালো। আমরাও আয়রন হ্যান্ডে শাসন করেছি। আওয়াব ওয়ার্ড ওয়াজ ল'। আজ তো শুনি কর্তাদের হুকুমই সব। দরকার হলে হাকিমকেই বদলি করে দেওয়া হবে। তাই দেশটা জাহান্নামে যাচ্ছে। এ্যাণ্ড দ্যাট গান্ধীজী—ওই একটিমাত্র মানুষই সারা দেশকে ক্ষেপিয়ে দিল।

অমৃত এতক্ষণ ওই কথাগুলো শুনছিল। সেকালের দণ্ডমুণ্ডের কর্তার মুখে ওই কথা শুনে অমৃত বলে।

—তাহলে কি আমরা স্বাধীন হবে না কোনদিন? চিরকাল পরাধীন থাকাই ভালো ছিল?

আগুনে ঘি পড়েছে। দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বলেন অসিতবাবু।

—হোয়াট! এর নাম স্বাধীনতা? দেশের কিছু মানুষ শুধু চুরি করবে আর কাজ

না করে সব খাবে! আর লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু দারিদ্র্য-বেকারীর মধ্যে ডুবে থাকবে? ছেলেরা জাহান্নামে যাবে--

অমৃত বলে।

—আমরা একদিন হয়তো ভুল শুধরে নোব। তাই বলে ব্রিটিশের অধীনে চিরকাল থাকতে হতো—এ যুক্তিকে মানতে পারি না।

অসিতবাবু এতক্ষণ অমৃতকে নীরব শ্রোতা আর সমর্থক ভেবেই ওই সব কথা শুনিয়েছিলেন। এখন অমৃতকে প্রতিবাদ করতে দেখে বৃদ্ধ চটে উঠেছেন। আগেকার মত হাকিমী মেজাজ নিয়ে সদর্পে হুমকি দিয়ে ওঠেন।

—স্ট্যাণ্ড আপ এ্যান্ড স্পিক প্রপারলি। কার সঙ্গে কথা বলছো এটা তোমার জানা উচিত ছিল ইয়ংম্যান! আই ক্যান প্রসিকিউট ইউ দি কোর্ট অব ল'। আণ্ডার সেকশন--

অমৃত ওঁর চিৎকারে বিস্মিত হয়েছে।

রাত্রিও জানে বাবার এই স্বভাবের কথা।

এই ব্যাপারটা কিছুদিন থেকেই ঘটছে। ডাক্তার বলেন—নার্ভাস ব্রেকডাউন।

রাত্রিও দেখেছে বাবার এই আকস্মিক উন্মত্ততা, ও যেন বদলে যায় হঠাৎ। তাই হাই ব্লাড প্রেসারের রুগী তার বাবাকে সামলাবার চেষ্টা করে রাত্রি।

—ড্যাডি! তোমার ওষুধটা খাবার টাইম হয়ে গেছে। ডিনার খাবারও দেরী হয়ে যাচ্ছে। প্লিজ—

অসিতবাবু এখানের কথাবার্তায় আর কোনো তৃপ্তির সন্ধান পান নি। বরং রেগে উঠেছেন ছোকরার ওই সব প্রতিবাদের কথায়। তিনি তাই এড়িয়ে যেতে চান। কি ভেবে থামলেন তিনি।

তাই ক্লান্ত স্বরে বলেন অসিতবাবু।

—ট্রাই টু মেণ্ড ইয়োর হ্যাবিট মাই ফ্রেণ্ড। বেবী কাম এলং।

রাত্রি এগিয়ে যায় বাবার কাছে। নীরব রাগে উত্তেজনায় বোধ হয় কাঁপছেন তিনি। মেয়েকে সাবধান করেন অসিতবাবু।

—ভবিষ্যৎ-এর জন্য সাবধান বেবী, সব বাজে লোকদের এড়িয়ে চলাই সেফ। দে ডু নট নো হাউ টু স্পিক। চল—

রাত্রি বাবাকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

অমৃত একাই ঘরে রয়েছে। এই বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে এ জগতের কোন যোগাযোগ নেই। ও যেন ইংরেজের অতীত শান্তিমত্ততার প্রতীক। তাদেরই ভাবধারার ধারক এবং বাহক। আজও সেই যুগেই রয়ে গেছে। আজকের যুগে ওরা বাতিল প্রাণী।

চলে যেতে যেতে অসিতবাবু তখনও গজগজ করেন।

—অল রট। ননসেন্স।

অমৃত চুপচাপ কি ভাবছে। মিটমিটে আলো জ্বলছে একদিকে। পর্দাগুলোও এইবার ছিঁড়ে যাবে। এ বাড়ির দারিদ্র্যকে চেপে রাখার সব চেষ্টাই যেন কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই সেটা প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে।

রাত্রি এসে ঢুকলো। ওঁর মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। সে জানায়।

—এককালে যে ভাবে বাস করেছেন বাবা এখন সে অবস্থার কিছুই নেই। সব বদলে গেছে। হঠাৎ ওঁর শরীর ভেঙে গেল। তারপর থেকেই এমনি হয়ে গেছেন। কিছু করার নেই আর।

অমৃতের কাছে ও যেন কৈফিয়তের সুরে কথাগুলো বলছে। অমৃত জানায়।

—না, না। ওসব নিয়ে কিছুই মনে করি নি।

রাত্রি ওর দিকে চাইল বিষণ্ণ চাহনি মেলে।

হঠাৎ কড়াটা আবার নড়ে ওঠে কর্কশ শব্দে। অমৃত লক্ষ্য করে রাত্রির মুখে ফুটে ওঠে বিবর্ণতার ছায়া। অমৃতের মতে হয় এখানে না এলেই ভালো করতো সে। এদের ব্যক্তিগত জীবনে হঠাৎ অনধিকার প্রবেশ করে সে একটা গোলমালের সৃষ্টি করেছে।

হয়তো রাত্রির পরিচিত কোনো ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সামনে অমৃতের এই উপস্থিতির জন্য বোধহয় বিব্রত বোধ করছে রাত্রি। তাই অমৃত জানায়।

—আমি বরং উঠি।

কড়াটা তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠেছে। রাত্রি জানে কে ডাকছে তাকে।

অমৃত কি ভেবেছে সেটা অনুমান করে ওই সময়েও রাত্রির বিষণ্ণ ঠোঁটে একটু হাসির নীরব আভাস জাগে।

অমৃতও দেখেছে রাত্রিকে, কি এক রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে সে।

অমৃতের কথায় রাত্রি বলে।

—একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনিই আসছি ওর সঙ্গে কথা বলে।

দরজাটা খুলে রাত্রি কার সঙ্গে কথা বলছে গলার স্বর একটু নামিয়ে। কিন্তু ওদিকের ভদ্রলোক গলা এক পর্দা চড়ায় তুলে জানায় বেশ মেজাজ নিয়ে।

—আজ তো ডেট দিয়েছিলেন। এই নিয়ে তিন মাসের ভাড়া বাকী হতে চললো। কতদিন আর ঘুরবো বলুন?

অমৃত চুপ করে ওই চড়া গলায় শাসানিটা শুনছে।

রাত্রি ওকে কি বলবার চেষ্টা করে। কিন্তু বাড়িওয়ালার সরকার সে সব কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করে না। তাই জানায় সে কঠিন স্বরে।

—ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। সামনের সপ্তাহে আসছি, টাকা আমার চাই, না হলে ডিফল্টার চার্জ দিয়ে কোর্টে নালিশই করতে হবে। ওঁকেও জানিয়ে দেবেন। ওসব ইংরাজীওলাকে ঢের দেখেছি।

কথাগুলো সদর্পে জানিয়ে ভদ্রলোক তেতলার ফ্ল্যাটের দিকে এগোলো।

রাত্রি দরজাটা বন্ধ করে একটু দাঁড়িয়েছে ওখানে। ও জেনেছে অমৃতবাবুর এসব কথা শুনতে বাকী নেই। লজ্জা বোধ করে রাত্রি। তাদের পারিবারিক জীবনের এই দৈন্য আর অসহায় অবস্থাটা জেনেছে অমৃত, সেখানে গোপন করার কিছুই নেই। রাত্রিও গোপন করতে চায় না।

রাত্রির মনে হয় তার মনের অনেক গোপন যন্ত্রণা আর হতাশাকে দেখেছে ওই অমৃত। রাত্রি যেন ওর কাছে সহজ হতে চেয়েছে, তাই লুকোবার চেষ্টা করে নি ওসব।

চুপ করে এসে ঘরে ঢুকলো রাত্রি।

ম্লান হেসে বলে সে।

—দেখছেন চাকরীর কেন দরকার? তাই ঘুরছি হন্যে হয়ে।

অমৃত হেসে ফেলে। ওর কাছে জীবনের এই যন্ত্রণাটা আরও কঠিন, আরও নগ্নরূপে ফুটে উঠেছে। অমৃত বলে।

—এ আর নোতুন কি? এ সব আমারও দেখতে হয়, এসব কিছু আমিও চিনি।

রাত্রি ওর দিকে চাইল।

অমৃতের পোশাকে ওর মুখচোখে সেই অভাবের ছায়াটার সঙ্গে নিজেরও একটা নিবিড় সাযুজ্য খুঁজে পায় রাত্রি। ক্লান্ত স্বরে বলে রাত্রি।

—আমরা সবাই যেন হারিয়ে গেছি এমনি অন্ধকারে। কোন পথ নেই।

অমৃত বলে।

—আমার বাবা কিন্তু এটা মানতে চান না। আজীবন প্রায় জেলে কেটেছে অগ্নিমন্ত্রের উপাসক হয়ে। আজও বলেন—দিন বদলাবেই। অন্ধকার কখনও চিরন্তন নয়, হতে পারে না। আমরা মিথ্যে স্বপ্ন দেখি নি। একদিন তা সত্যি হবেই।

রাত্রি শুনছে কথাগুলো।

এই অন্ধকার তার সবকিছু স্বপ্ন আশাকে কি নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবু মনে হয় যদি একটা ভালো চাকরী মেলে, রাতরাতি সব বদলে যাবে। কিন্তু কবে তা জানে না।

রাত্রি বলে—কে জানে! তবে আমার বাবাকে দেখে মনে হয় অন্ধকারেই হারিয়ে গেছেন তিনি। কারণ কি জানেন? ওঁরা ইংরেজের স্তাবক হয়ে ওই সংগ্রামীদের স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। আর আপনার বাবার কালের যুবশক্তি সেদিন আগ্রাসী ইংরেজকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন সত্যের জন্য। তাই আজও তাঁরা আশা করেন—স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চান। কোন্‌টা সত্যি আমরা তা জানি না।

অমৃত রাত্রিকে দেখছে। ফর্সা পানপাতার মত মুখের চিকণ আদল। নাকটা টিকলো। দু' চোখের চাহনিতে বেদনা ছাপিয়ে একটি সজল কমনীয়তা এখনও রয়ে গেছে। ওদের কোনও বড় অফিসারের ঘরণী হয়ে পালিশ প্রসাধনে ওই রূপকে উজ্জ্বলতর করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা ছিল।

কিন্তু দিনবদলের পালায় রাত্রিকেও আজ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড করাতে হয়। লাইন ছেড়ে এগিয়ে যাবার অপরাধে অনেক অতি সাধারণ মেয়ের বাক্যবাণও শুনতে হয়।

হয়তো একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়ে গেছে রাত্রির, যার জন্য আজ সে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে নি। তাই নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

বাইরে রাত নেমেছে। অমৃতের পাড়ার পথ-ঘাট ভালো নয়। অমৃত বলে—আজ আসি।

রাত্রি ওর দিকে চাইল। ওর শান্ত নরম কমনীয় মুখে হাসির একটু দীপ্তি ঝকঝকিয়ে ওঠে। অমৃতকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলে।

—আবার আসবেন কিন্তু। অমৃত ওর কণ্ঠস্বরে একটু অবাক হয়। দু'এক জায়গায়

সে এর আগেও গেছে কোনো সহপাঠিনী না হয় পরিচিত মহিলার বাড়িতে। দেখেছে তাদের ব্যবহার। সব কিছু কৃত্রিমতা আর গিল্‌টি করা ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল।

আজকের এই মেয়েটিকে খুব কাছ থেকে দেখেছে অমৃত। ওর কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে গাঢ়তার ছায়া। মনে হয় ও একা নিঃসঙ্গ। এই নগ্ন দারিদ্র্য আর ওই ব্যর্থ অতীতের মাঝে হারানো একটি মানুষের যন্ত্রণার জগৎকে দেখে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

অমৃত বলে—দেখা হবে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে।

রাত্রি জানায়—হলে খুশী হব।

দু'হাত তুলে নমস্কার জানায়। অমৃত বের হয়ে এল।

আজকের সন্ধ্যাটা অমৃতের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। পার্কের আবছা অন্ধকারে তখনও লোকজন ঘোরাফেরা করছে। রেইনট্রি গাছের ছায়া-অন্ধকারে কাদের সচকিত হাসির শব্দ ওঠে। সব ছোট ছেলেমেয়ে হেসে গল্প করছে।

অন্যদিকে অন্ধকারে আজ সারা শহরে চলেছে পাশবিক মত্ততা। মানুষ ধুঁকছে বাঁচার জন্য। কেউ গর্জে উঠছে। তবু এই বহু বেদনা-বঞ্চনাকে ছাপিয়ে ওই হাসির ধারালো—প্রাণ-উচ্ছল শব্দ উঠছে ওখানে।

অমৃতের মনে হয় বাইরের এই জীবনের অতলে একটি বেদনার স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে চলেছে, সেখানে জাগে শুধু শূন্যতার বেদনা। অনেক চাওয়া সেখানে ব্যর্থ হয়ে দীর্ঘশ্বাসের হাহাকারে নিঃশেষ হয়ে যায়। সব কামনা সেখানে অর্থহীন—হয়তো বিকৃতির কালোয় বিবর্ণ।

সেই কঠিন জীবনকেই বারবার স্পর্শ করেছে অমৃত। তার পথের উপর এদেরই ভিড়। সেও এদেরই একজন।

সাবিত্রী বাড়ি ফিরছে। সারাদিন পাখীগুলো বাসা ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় আহার্যের সন্ধানে। আবার দিন শেষের অন্ধকার নামলে তারা ফিরে আসে হারানো কুলায়। আশ্রয়ের আশায়।

ওরাও ফিরছে।

অশোকও ফিরছে আজ।

সাবিত্রীও দেখেছে ঘরে-বাইরে তার জীবনের সেই তমসাকে। মাও আগে এসব কথা বলতো। এখন তার মুখেও কড়া কথা শোনা যায়। মা তাকে শুনিয়ে বলে।

—ধিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। কারো ঘাড়ে যে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হবো তার উপায় নেই। মরণ!

বসন্তবাবু তবু চেষ্টা করেন নিষেধ করতে স্ত্রীকে। তিনি জানেন। মেয়ের কোন গতি তিনি কিছু করতে পারেন নি। বলেন।

—কি যা-তা বলছো অমুর মা?

অশোক জানায় সাবিত্রীকে।

—আমাদের কাজকম্মো কর। দিনরাত তো বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছিস। দিস্ ইজ সোস্যাল ক্রাইম। সামাজিক অপরাধ এটা।

সাবিত্রী মায়ের কথায় রেগেছিল। ওর কথা বলে।

—তুই কি করছিস? দিনরাত দলবাজী—চিৎকার আর সব কিছু গোলমাল পাকানোর ষড়যন্ত্র। এই নিয়ে বড়াই করিস।

অশোক গর্জে ওঠে।

—থামবি তুই! রিএ্যাক্‌সেনারি কোথাকার? বুঝলি তোদের এই মিডল্ ক্ল্যাশ নোংরা মনোভাবটাই এর জন্য দায়ী। কি আছে তোর যে হারাতে ভয় করিস? মান সম্মান কিছু আছে আর?

—তাই বলে অন্ধের মত তোর মতটাকে অচল জেনেশুনেও মানতে হবে?

সাবিত্রী জবাব দিতেই অশোক ধমক দেয়। ওর মুখের উপর কথা বললেই চটে যায় সে।

— বুঝিস তুই? একটা ছেলের কাঁধে ভর করে হাঁড়িকুঁড়ি ঠেলা আর বৎসরান্তে একটি করে অভিশপ্ত শিশুকে এনে পৃথিবীর জঞ্জাল বাড়ানোই তোদের আদর্শ। মাও তাই পরম সত্য বলে জানে।

সাবিত্রী ওর এই সব কথায় সাড়া দিল না। বৃথা তর্ক ভালো লাগে না তার।

বাড়িতে তার জন্য এমনি ব্যঙ্গ আর আঘাতগুলোই স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে।

অনেক চেষ্টা করেছে সাবিত্রী ভালোভাবে বাঁচার।

কিন্তু বাড়ির মানুষগুলো তবু তাকে ক্ষমা করতে চায় না। ওরা ভাবে এই মন্দভাগ্যের জন্য সাবিত্রীই দায়ী, তবু জানে না সে, চেষ্টা করছে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যেই।

শুধু একটি মানুষকেই দেখেছে সাবিত্রী বাড়িতে যে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। সে তার দাদা অমৃত।

কিন্তু সেও অসহায়। মুখ বুজে শুধু পথ চলেছে। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে। সাবিত্রীও দেখেছে তাকে। এমনি করে সবাই এক মৌন মিছিলের সামিল হয়ে অতলান্ত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ আজ সাবিত্রী তবু কোথায় একটা আলোর নিশানা দেখেছে। তার অন্ধকার মনে সেই আলোর ছোঁয়া একটু আশা আর কি অজানা আশ্বাসের সুর এনেছে।

আজ স্কুলে কাজলদা তাকে দেখে নি। এড়িয়ে গেছে তাকে সবিত্রী ইচ্ছে করেই। কি ভাবে তাকে কাজলদা দেখবে এটা সে জানে না। তবে মনে হয় কাজলদা তাকে ভোলে নি আজও। অনেক কথাই মনে পড়ে।

এই অন্ধকার বাড়িটার সেই দিনগুলো আজও নিশ্চয় ভোলে নি কাজলদা। একটি মেয়ের চোখে সেদিন সে কি স্বপ্ন এনেছিল। তার সদ্য জেগে ওঠা কুমারী মন একটি ফুলের কুঁড়ির মত আলোর জগতে উত্তরণের স্বপ্ন দেখেছিল রূপ গন্ধ বর্ণ নিয়ে—সেদিন তাকে ঘিরে ছিল একটি তরুণ, সে ঐ কাজল। আজকের নামকরা শিল্পী কাজল মুখার্জী।

সাবিত্রী এসে ঘরে ঢুকলো।

সাবিত্রীর মনে হারানো সুরটা গুনগুনিয়ে ওঠে কি সজীবতা নিয়ে। মনে হয় আগেকার সেই দিনগুলো ফিরে এসেছে।

ছোট্ট বাড়িটায় সেবার বৃষ্টি নেমেছে—আকাশ ছেয়ে এসেছে কালো মেঘ, অনেক দিন পর তাপসন্তপ্ত মাটিতে নেমেছে বৃষ্টির অঝোর ধারা। সাবিত্রী তখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে।

চঞ্চল মেয়েটি চুল এলিয়ে দিয়ে ভিজছে সেই বৃষ্টিতে। কারা দাপাদাপি করছে উঠোনময়। হঠাৎ দেখেছিল সেদিন সাবিত্রী কাজলকে—সেও নেমেছে টিনের ঘর থেকে মুক্ত আকাশের নীচে ওই উঠোনে বৃষ্টির মধ্যে।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর ভিজে দেহের দিকে চেয়ে আছে কাজল। সেদিনের সেই তরুণের চোখে ওর শুচিস্নাত নিটোল দেহটাকে মনে হয়েছিল বৃষ্টিভেজা যুঁই ফুলের পাপড়ি। তাতে ফুটে উঠেছে চিকণ সজীবতা—বলিষ্ঠ রেখাগুলো ভিজে শাড়ির আবরণ

ভেদ করে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, মুখখানা ভিজে নরম টসটসে হয়ে গেছে। হাত দুটোয় বৃষ্টিভেজা লতার দাক্ষিণ্য আর ব্যাকুলতা আকাশের কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়েছে ওর দু'চোখে। সেদিনের তরুণ ওই সদ্যজাগর সাবিত্রীর দেহের দিকে বিমুগ্ধ চাহনিতে চেয়ে আছে।

—এ্যাই!

চমকে ওঠে সাবিত্রী।

কাজলের চোখে ওই তৃষ্ণার বিচিত্র চাহনি দেখেছে সাবিত্রী, কাজল হাসছে। বৃষ্টির ধারার মাঝে ভিজছে দু'জনে। সাবিত্রী বলে।

—বেহায়ার মত কি দেখছো হাঁ করে?

—তোমাকে। কাজল জবাব দেয়।

সাবিত্রীর সারা মনে কি শিহরণ জাগে।

বৃষ্টির দাপটে টিনের চালে ঝমঝম সুর উঠেছে। তার মনে এলামেলো ঝড়ের দোলা। এই সাড়া এর আগে শোনে নি।

সাবিত্রীকে ওর কাছে টেনে নেয়। হাঁপাচ্ছে সাবিত্রী।

তার সারা শরীরে কি ঝড় বইছে। একটা বুকচাপা উত্তাপ তার দেহ ছাপিয়ে সাড়া তোলে। নিজের দেহের কোণে কোণে এমনি একটা তীব্র ব্যাকুলতা মেশোনো ছিল তা জানতো না সাবিত্রী।

কাজলের মুখটা ওর গালে চেপে বসেছে—জ্বলে যাচ্ছে তার সারা দেহ, ওই ধারাস্নানেও সেই উত্তাপ কমে নি।

—এ্যাই! না না! সাবিত্রী কাঁপছে।

নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাঁপাচ্ছে সাবিত্রী দূরে দাঁড়িয়ে।

—কি হল? কাজল ওকে কি বলছে।

—ধ্যাৎ! ভারি অসভ্য তুমি!

সাবিত্রী হালকা পায়ে বৃষ্টি ছাপিয়ে দৌড়ল। তখনও কাজলের হাসির শব্দ শোনা যায় ওই বৃষ্টির মধ্যে।

আজ থমকে দাঁড়ালো সাবিত্রী।

সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। তবু মনের অতলে একটা সুরের আভাস জাগে। সে সুর কাজলও ভোলে নি বোধহয়।

সুধাময়ী রান্নাঘরে একটা ছোট গামলায় ময়দা মাখছিল। রাতের খাবার বলতে রুটি আর কিছু তবকারী। ডালেব দামও বেড়ে গেছে, তাই ওটা তাদের কাছে এখন বিলাসে পরিণত হয়েছে।

ওঘরের ভাড়াটে লতিকা বৌদি সন্ধ্যার মুখে স্নান সেরে মুখে একটু পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে একটা ফর্সা শাড়ি পরে বেড়াতে বের হয়। এই বদ্ধ বাড়িটার দমবন্ধ করা পরিবেশে লতিকা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

অবশ্য ওপাশের নিতাই-এর মা বলে—চললেন ঢলানি এইবার। বুঝলে অমুর মা, এদিকে কতো সতীপনা, পার্কের দিকে গিয়ে ওর কাণ্ডটা দ্যাখো নি তো? কোন্ একটা ছোকরার সঙ্গে। মাগো মা—

সুধাময়ীর এসব আলোচনা ভালো লাগে না। জানে তার সমর্থন পেলে নিতাই-এর মা আরও রামায়ণ জুড়বে। বুড়ি লতিকার উপর হাড়ে চটা।

তাই বলে---ছিঃ ছিঃ মাগো! কি ঘেন্না। ছোঁড়া তো এখানে আসে মাঝে মাঝে।

সুধাময়ী বলে---ওসব কথায় কি দরকার খুড়িমা?

—অ!

নিতাই-এর মা অবাক হয় ওর নিস্পৃহতায়।

সুধাময়ী রান্নাঘরে গিয়ে ময়দা মাখতে বসেছে। রসভঙ্গ হতে নিতাই-এর মা বলে আপন মনেই।

---কাকে কি বলছি? ভালো লাগবে কেন? ঘা যে সর্বাঙ্গে। নিজের ছেলে ওই সোমত্ত মেয়েও তো ওই। তাই এতো ভাব।

এবাড়ির ওই মানুষগুলোকে সুধাময়ী দেখে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে। তখন দিন ভালো ছিল সুধাময়ীর, এবাড়ি থেকে তবু চলে যেতে পারে নি। আজ ওদের ব্যবহার, কথাবার্তা ভালো লাগে না। সাবিত্রীর সম্বন্ধে ওদের মন্তব্যগুলো তার মনে জ্বালা ধরায়।

সুধাময়ী এসব ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলো শুনেছে এর আগেও, জানে ওদের কথার প্রতিবাদ করলে তাতে বিপদ আর অশান্তি বাড়বে তাই চুপ করে এড়িয়ে থাকে। বার বার মনে হয়, এই বহু মানুষের ভিড় থেকে সরে থাকবে, ছোট্ট একটু বাড়ি হবে তাদের। সবুজেব চিহ্ন থাকবে আশেপাশে।

কিন্তু সুধাময়ীর সে স্বপ্ন সার্থক হয় নি। আজও এই অন্ধকারে পড়ে আছে আর মুখ বুজে সইছে এদের নানান্ কথা।

লতিকা বেড়িয়ে ফিরছে, নিতাই-এর মা যেন পথ চেয়েই ছিল।

লতিকাকে দেখে নিতাই-এর মা আপন মনে গজগজ করে ওপাশের বারান্দায়।

—মুখের লাগাম নেই বাছা। বয়স তোরও কম হল না। তুইও সোমত্ত ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, তাই বলে আর কারো সখ-আহ্লাদ থাকতে নেই? সেজে-গুজে বেড়াতে বের হবার এই তো বয়েস।

—কি হল পিসী? লতিকা নিতাই-এর মাকেই শুধোল। নিতাই-এর মা ওকে বলবার জন্য বসেছিল।

এবার নিতাই-এর মা বলে ওঠে।

—ওসব বাজে কথায় কান দিও না বাছা, ওই অমুর মায়ের কথা বলছিলাম—

গলা নামিয়ে বলে নিতাই-এর মা।

—বলে কি না তুমি নাকি পার্কে কোন ছোকরার সঙ্গে বসে হাসাহাসি করো। শোনো কথা?

লতিকাও জ্বলে ওঠে এসব শুনে। বিপদে-আপদে দায়ে-অদায়ে অমুর মাকে সাহায্য করে, আর সে কিনা এইসব কথা বলবে? লতিকার এই পরিবর্তনটা দেখে নিতাইয়ের মা বলে চলেছে।

—তুমি বাছা বলো না যে, আমিই বলেছি। কতো করো ওদের তা জানি। অমুর চাকরী করে দেয় নি কিনা মহীমবাবু তাই এসব তো বলবেই। কলিকাল বাছা।

লতিকা নীরব রাগে গুমরে ওঠে। নিতাই-এর মা এসব কথার যেন কোন গুরুত্বই দেয় নি, এমনি ভাব দেখিয়ে আবার বড়ি দিতে থাকে।

নিতাই কোন্ দোকানে কাজ করে, ওর মা অবসর সময় বড়ি দিয়ে দোকানে বিক্রী করে। তাতে দু'পয়সা আয় হয়।

সুধাময়ী ময়দা মাখছে। উনুনের আঁচে কি একটা তরকারী চাপিয়েছে। বসন্তবাবুও এখনও ফেরেননি। অন্যদিন বাড়ি থেকে গলির মোড়ে টুইশানি করতে যান, আজ বোধহয় কি কাজে আটকে পড়েছেন। সাবিত্রীও ফেরে নি—অশোকের অবশ্য ফেরার কোনো সময় নেই। অমৃত ছাত্র পড়াতে গেছে।

বদ্ধ ঘরের গরম উনুনের তাপে সুধাময়ী ঘামছে। এই জ্বালা তার দেহে-মনে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ লতিকার চড়া গলা শুনে সুধাময়ী চাইল।

রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লতিকা। রাগে অপমানে ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

—মাসিমা!

নিতাই-এর ওদিকে কান খাড়া করে রেখেছে। মনে মনে খুশী হয়েছে সে। সুধাময়ী শুধোয় লতিকাকে।

—আমাকে কিছু বলছো?

লতিকা জানায়—আপনার কাছে এসব কথা শুনবো ভাবি নি মাসীমা।

অবাক হয় সুধাময়ী—কি বলছো তুমি?

লতিকা ওকে দেখেছে। সুধাময়ী বলে—কি ব্যাপার বলো দিখি?

লতিকা কথা বাড়ালো না। তাই জবাব দেয়—ওসব আর নোংরা ঘেঁটে লাভ নেই।

—কি বলছো বাছা?

লতিকা বলে—কথাটা জানিয়ে গেলাম, আর যেন এসব কথা কোনদিন বলবেন না।

লতিকা মেজাজ দেখিয়ে চলে গেল। সুধাময়ী ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারে না। নীরবে চেয়ে আছে।

লতিকা কথাগুলো মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

সুধাময়ী দেখে নিতাই-এর মা কোথায় আশেপাশেই ছিল, আবছা অন্ধকারে ও এগিয়ে এসে সুধাময়ীকে গলা নামিয়ে শোনায়।

—ডাঁট। বুঝলে এসব ডাঁট। একা ওর স্বোয়ামীই চাকরী করে, আর অমুর বাবা এতো নামকরা লোক—অমু কিনা তিনটে পাশ করা ছেলে, সব ফ্যালনা? যা তা বল্লেই হ'ল?

হঠাৎ বাড়ির বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দে এবাড়ির ছন্নছাড়া মানুষগুলো চমকে ওঠে। এদের এখানে গাড়ি থামে মাঝে-সাঝে। সে গাড়ির নাম এ্যামবুলেন্স। সেবার

নিতাই-এর বাবা ওই গাড়িতে চেপে গেছল আর ফিরে আসে নি, ওঘরের মধু সাঁতরার বৌ ছেলে হবার সময়ও এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে গেছল। তাই সকলেই গাড়ি থামার শব্দে কোন এমনি খারাপ ব্যাপার ভেবেই বের হয়ে আসে।

সুধাময়ী ময়দা মাখা হাতেই চমকে ওঠে। সেবার অশোক কোথায় মিটিং-এ লাঠি খেয়ে হাসপাতালে গেছল। সেখান থেকে কারা ট্যাক্সিতে করে পৌঁছে দিয়েছিল তাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়।

সুধাময়ীর মনটা ভালো নেই। লতিকার কথাগুলোও তার মনে একটা নীরব প্রশ্ন তুলেছে। তার মাঝে গাড়ি থামার শব্দে হকচকিয়ে বাইরে আসে সুধাময়ী। বুক কাঁপছে তার কি ভাবনায়।

ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। একটা ঝকঝকে গাড়ি এসে থেমেছে তাদের বাড়ির দরজায়। তার থেকে নামছে বসন্তবাবু, সুধাময়ী ভয় জড়ানো চোখে দেখছে তাকে। নিশ্চিন্ত হয় সে—না। কোন কিছুই হয় নি। অন্তত মানুষটা নেমে এগিয়ে আসছে। সুস্থই আছে।

ড্রাইভার গাড়িটা মাঠে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। বসন্তবাবু ওদের দেখে বলেন,—কিগো?

সুধাময়ী তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বসন্তবাবু আজ ওবেলায় রজনীর ওখানের অপমানটা ভুলেছে পটলের সান্নিধ্যে এসে। ছেলেটা নাম করেছে, বড় হয়েছে তবু তাকে ভোলে নি। বসন্তবাবু শোনায়।

—আমারই এক ছাত্রের গাড়ি। তুমিও জানো—দীঘির পাড়ের মিত্তিরদের পটল, এখন মস্ত লোক। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে, টেনে নিয়ে গেল। ওরই গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

লতিকাও বের হয়েছিল। নিতাই-এর মাও এসেছে। বসন্তবাবুদের বাড়ি ঢুকতে দেখে ওরা যেন খুব খুশী হয় নি। লতিকা চুপ করে ভেতরে আসছিল।

নিতাই-এর মা বলে।

—বুঝলে লতিকা, পরের গাড়ির গরমে এমন মেজাজ কিসের বাছা? মহীম তো পেরায়ই ট্যাক্সিতে চড়ে।

সাবিত্রীও বাড়ি ফিরছিল, গাড়িটা দেখেছে সেও। বাবাকে নামতে দেখেছে সাবিত্রী।

স্কুলের কাজ সেরে সাবিত্রী ফিরছে। ক্রমশঃ সাবিত্রী তার নিজের পথ যেন খুঁজে

পাচ্ছে। বাড়ির কাছে এগিয়ে এসে ওদের কথা শুনে দাঁড়াল সাবিত্রী। সাবিত্রী জানে নিতাই-এর মায়ের স্বভাবের কথা। ওকে তাই আমল দিতে চায় না।

লতিকা বৌদি আজ আর সাবিত্রীকে দেখে দাঁড়ালো না, বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। অন্যদিন ডেকে কথা বলে, আজ এড়িয়ে গেল তাকে, এটা সাবিত্রীর বুঝতে দেরী হয় নি। বোধহয় একটা কিছু ঘটেছে।

সুযোগ বুঝে নিতাই-এর মা সাবিত্রীর কাছে এগিয়ে এসে বলে।

—দেখলি তো ওই লতিকার গরম। ওর স্বোয়ামী ছাড়া এ বাড়িতে যেন আর কেউ গাড়ি ট্যাক্সি চাপতে পারবে না। তোর উপর তো বেজায় হিংসা সাবিত্রী। আরে রূপগুণ কি তোর একা থাকবে ওই লতিকারই। ওর স্বামী কি মস্ত লোক। কেন অমুর বাপই কি কম এলেমদার?

সাবিত্রী দাঁড়ালো না, ওর কথার কি দাম তা জানে সে। তাই ভিতরে চলে গেল।

নিতুর মা গজগজ করে তাই।

—ধিঙ্গী মেয়ের আবার ডাঁট দেখ না? গুষ্টিশুদ্ধ যেন গরমে পা পড়ছে না। কিসের এত দ্যামাক তা জানি বাপু।

বসন্তবাবু তখনও পটলের বাড়ি-গাড়ির গল্প করে চলেছেন স্ত্রীর কাছে।

—বুঝলে অমুর মা—লক্ষ্মী যেন বাঁধা পড়েছে। ও বলে টুইশানি করে কতো পান মাস্টারমশাই? ওসব করে কি লাভ?

সুধাময়ী অবাক হয়ে দীঘির পাড়ের সেই সিট্‌কে ছেলেটার কথা শুনছে। বসন্তবাবুর কথায় শুধোয় সুধাময়ী।

—তা কি বললে তুমি?

—কত পাই—বললাম। তাতে পটল শোনালো, যদি আপত্তি না থাকে চলে আসনু আমার এখানে। একজন অনেস্ট লোকের দরকার। আর ওর থেকে বেশীই পাবেন এখানে।

সুধাময়ী এই অন্ধকারের মাঝে কি যেন আলোর সন্ধান পেয়েছে। হয়তো এবার একটা সুযোগ এসেছে, তার অভাবের সংসারের হাল বদলাবে। সুধাময়ী বলে।

—তুমি রাজী হয়েছো?

বসন্তবাবু কি ভাবছেন। মনে হয় এই অনিশ্চিতের মধ্যে ঘুরে মরার থেকে তবু একটা কাজ নিলে ভালো করবেন। অমুর কথাটা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু পটল তাকে প্রকারান্তরে জানিয়েছে যে, অমুর ভালো চাকরী অন্যত্র কোথাও জুটবে, পটল মাস্টারমশাইকেই বিশ্বাস করতে পারে। তাই উনি যদি মত দেন, এখানে কাজ নেন সে খুশী হবে।

বসন্তবাবু ভাবছেন কথাটা, বলেছেন পটলকে—ভেবে দেখি বাবা। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছেড়ে মুনিব-ভৃত্যের সম্পর্কটা গড়বো কি না একটু ভেবে দেখতে দাও।

ওই কথাটা সুধাময়ীকে বলতে সে অখুশী হয়ে ওঠে—ওসব বলতে গেলে কেন? বসন্তবাবু স্ত্রীকে দেখছেন। সুধাময়ী বলে।

—ওসব আজ মিথ্যা হয়ে গেছে। কি লাভ হবে তাতে? এদিকে দিন চলে না, ছেলেটারও চাকরী নেই। আইবুড়ো ধিঙ্গী মেয়ে ঘাড়ের উপর, এখন ওসব দেখলে চলে? চারিদিকে ধার-দেনায় ডুবে আছি—মান-সম্মান থাকছে যে এখনও ওই সব বড় বড় কথা বলবে কাউকে?

সাবিত্রী বাবার দিকে চেয়ে থাকে। বসন্তবাবুর মুখে ফুটে উঠেছে অসহায় একটা ভাব। নিজের এতদিনের আদর্শ বিকিয়ে দিতে হবে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য এই কথাটা ভাবতেও মন বিষিয়ে ওঠে তাঁর আজও।

বসন্তবাবুও জানেন সব কথা। জানেন এ বাড়ির মানুষগুলো আধপেটা খেয়ে ধুঁকছে। তবু এত সহজে নিজেকে বিকিয়ে দিতে চান নি। পটলের কাছে তাঁর মাথা হেঁট করতে লজ্জা হয়েছে। তাই মতামতটা সোজা জানতে পারেন নি।

সাবিত্রী বুঝেছে বাবার এই অবস্থার কথা। তাই বলে ওঠে সাবিত্রী।

—এ সব ব্যাপারে বাবাকে জোর করে কিছু করতে বলো না মা? বাবা যদি ভালো না বোঝেন কেন যাবেন সেখানে।

—থাম তুই সাবি।

সুধাময়ীর মুখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

বসন্তবাবু মেয়ের কথায় খুশি হন। তবু সাবিত্রী তাকে ভুল বোঝে নি।

কিন্তু সুধাময়ী ফোঁস করে ওঠে। আজ তার কাছে সবকিছু মিথ্যা হয়ে গেছে। তাই বলে।

—সব তাতে তুই কথা বলিস না। তোর দাদা আর তোর মুরোদ বুঝেছি। এখন

মুখ বুজে থাক। সংসার যে চালাচ্ছে তার দিকটাও দেখবি তো? সুধাময়ী দৃঢ়স্বরে বলে স্বামীকে।

—তুমি বাপু কালই পটলকে গিয়ে বলো, তুমি রাজী আছো।

বসন্তবাবু কি একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছেন, ভয়ও হয়। তাই স্ত্রীকে অনুনয় করছেন কাতর স্বরে, যেন নিষ্কৃতি চান তিনি।

—কি বলছো এসব অমুর মা? অভাবের জন্য শেষকালে ছাত্রের কাছে গোলামী করবো?

—নয়তো কি ভিক্ষে করলে মান সম্মান থাকবে? বলো তাহলে কাল থেকে আমিই শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াবো!

— বড় বৌ!

বসন্তবাবু চমকে ওঠেন। ওর গালে যেন অতর্কিত একটা আঘাত এসে পড়েছে। অস্ফুট কণ্ঠে বলেন তিনি।

—কি বলছো অমুর মা?

সুধাময়ীর দু'চোখে জল নামে কি বেদনায় আর জ্বালায়। বসন্তবাবুর সব আদর্শ কোথায় উবে যাচ্ছে, তিনিও আজীবন সংগাম করে হেরে গেছেন। বলেন।

—তোমার কথাই থাকবে অমুর মা; সব যখন গেছে, তখন এই দুর্বলতাটুকুই বা থাকে কেন? আদর্শও আজ অবান্তর। ওখানেই গোলামী করবো। তুমি চুপ করো।

বসন্তবাবুর কণ্ঠস্বর বদলে গেছে, তিনি অন্য মানুষে পরিণত হয়েছেন। সাবিত্রী বাবার দিকে চেয়ে থাকে। ও যেন প্রাণহীন একটি শব।

আবছা অন্ধকারে অমৃতও বাড়ি ঢুকেছিল। বাবা-মায়ের কথাগুলো সে শুনেছে। বাবার মনের ওই সংঘাতটাকে দেখেছে অমৃত। দেখেছে তার বেদনাটা।

কিন্তু সব মূল্যবোধ আজ বদলে গেছে। সব আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে। তাই বসন্তবাবুও হেরে গেছেন। নিঃশেষ আত্মসমর্পণ করেছেন সেই অভাবের মধ্যেও বেঁচে থাকার চেষ্টাটুকুর জন্য।

অমৃত চুপ করে দেখছে—তার কাছে এটা বোধহয় যেন নিষ্ঠুর পরাজয়।

অমৃতও শত চেষ্টা করে ওই বৃদ্ধকে সম্মান নিয়ে শেষ জীবনটাকে কাটাবার পক্ষে কোন সাহায্য করতে পারে নি। ওরা সবাই হেরে গেছে। অমৃতের প্রচেষ্টা এখানে

মূল্যহীন। এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে ওরা কেউ বাদ যায় নি। অমৃত এক জায়গায় কঠিন হয়ে উঠেছে।

—দাদা!

অমৃত সাবিত্রীর ডাকে চাইল। সাবিত্রীও ভেবেছে কথাটা। তার জীবনেও এই আদর্শ নিয়ে সে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে শিউরে উঠেছে। বলে সে অমৃতকে।

—বাবা ঠিকই করেছে দাদা? এছাড়া পথ কই?

অমৃত জবাব দিল না। সে সাবিত্রীর চোখে-মুখে কিসের অুসন্ধান করছে।

ওরা এত সহজে এই পরাজয় আর নিঃশেষ আত্মসমর্থনকে মেনে নিতে পারে না, তাই বলে ওঠে অমৃত।

—এ কিছুতেই হতে পারে না সাবিত্রী! বাবা শেষ কালে ওখানে যাবেন?

সাবিত্রী দাদার দিকে চাইল।

—তাহলে পথ কি? না খেয়ে মরবো সবাই, পথ তো নেই আর।

—জানি না! তারই সন্ধান করছি সাবিত্রী! ওই পটলবাবুর পরিচয় আমি জানি। বাবা শেষকালে ওর চাকরী করতে যাবেন এটা ভাবতে পারি না।

ওরা দু'জনে কি ভাবছে।

সুধাময়ীর গলা শোনা যায়।

—এসো, খেয়েদেয়ে উদ্ধার করো আমাকে। আর সেই হতচ্ছাড়া কোথায়? রাতদুপুর অবধি কোথায় থাকে?

—ভয় নেই। এসে গেছি মাদার? ডিনার রেডি করো। অশোক ঢুকতে ঢুকতে সাড়া দেয়।

সুধাময়ী গজগজ করে।

—কোত্থেকে সেটা জোটে তার খবর রেখেছিস?

—আপ্‌সে! অশোক বলে ওঠে।

বসন্তবাবু খেয়েদেয়ে ও ঘরের তক্তপোষের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। দেহ-মনের উপর দিয়ে বেশ খানিকটা ধকল গেছে। আজকের সেই ঘটনাগুলো তার মনের উপরও

একটা চাপের সৃষ্টি করেছে। রজনী-ভুবনবাবুরা ওখানে দরবার করেছিল। রজনীবাবু তাকে দেখেও হয়তো এড়িয়ে গেছে। বেশ বুঝেছেন বসন্তবাবু ওখান থেকে কোন রকম সাহায্য তিনি পাবেন না। ফেরার সময় সেই মিছিলের ছেলেদের কথা মনে পড়ে। তাদের নির্মম ব্যবহারটা ভোলেন নি।

ওদের মুখগুলোর সঙ্গে অশোকের মুখের গভীর মিল আছে। উদ্ধত সেই ছেলেটি তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছল অত লোকের সামনে দিয়ে, কেউ প্রতিরোধ করে নি। বাধাও দেয় নি। নিষ্ঠুর আনন্দে তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অসহায় একটি বৃদ্ধের উপর, যে একদিন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে সর্বস্ব ত্যাগ করে উত্তরপুরুষদের জন্য স্বাধীনতা কায়েম করতে চেয়েছিল।

বসন্তবাবু চুপ করে কি ভাবছেন। ওই চরম অপমানিত হবার পর পটলকে দেখেছিলেন। আজ সে প্রভূত টাকা রোজকার করেছে। ওই ছেলেগুলোর মত তাকে সে অপমান করে নি। এবং আগেকার পরিচয় নিয়ে সন্তানের সঙ্গে কথা বলেছে। তার বাড়ি নিয়ে গেছে।

পটলের ওই বিরাট সম্পদ, চালু ব্যবসা কারখানা কোত্থেকে এল তা জানেন না তিনি। তবু আজ সেই পটলের কাছেই তাকে মাথা নীচু করতে হবে সংসারের জন্য।

বাইরে বারান্দায় ওরা খেতে বসেছে। বসন্তবাবু ওদের কথাগুলো শুনতে পান। অমৃতের একটা চাকরীও জোটে নি, সাবিত্রীর বিয়ে দিতেও পারেন নি। নিজেদের একটু আশ্রয়ের আশ্বাসও নেই।

ওই সত্য আদর্শ আর সম্মানের মিথ্যা মোহে সব হারিয়ে আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ তাঁরই অক্ষমতা আর দুর্বলতা। সেই দুর্বলতাকেই তিনি আজ প্রত্যক্ষ করেছেন নির্মম সত্যরূপে।

অশোকের গলা শোনা যায়।

—ওল্ডম্যানের নাকি চাকরী হয়ে গেছে শুনলাম? কোনো এক শাঁসালো ছাত্র অফার দিয়েছে।

বসন্তবাবু চুপ করে কথাটা শুনছেন। ওই ছেলেটিকে তিনি দেখতে পারেন না। সংসারের কোনো কিছুতেই নেই অশোক।

অমৃত-সাবিত্রী তবু নিজেদের চেষ্টায় যাহোক কিছু সংসারে আনে, আর অশোক

জানে জন্মগত অধিকারে সে এখানেই ঠাঁই পেয়েছে। সেই দাবীতেই সে এখানে কায়েম থাকতে চায়।

ওরা তাকে বলে—ওল্ড ফুল। বুড়ো, অথচ এই বুড়োর রোজকারেই ওদের দিন চলছে। ওই মানুষগুলোর মুখে অন্ন জোগাবার জন্যই বসন্তবাবু তাঁর সম্মান-আদর্শ সব কিছুকে বিসর্জন দিয়েছেন।

সেদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের মুক্তিযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—আজ এই তার মূল্য, আর সংসারের জন্য নিজের আদর্শকেও বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন তার বিনিময়ে পেয়েছেন তিনি এই কঠিন আপ্যায়নের ভাষা।

অমৃত আর অশোক দুজনে ওপাশের ঘরে থাকে। অমৃতও শুনেছে কথাটা।

বাবাকে এই বয়সে চাকরী নিতে হবে আবার এটা ভাবতে তারও ভালো লাগে না। চাকরী একটা সে পেলে খুশী হতো।

অশোকের এই সময়টা একটু কাজ থাকে না। তাও কিছু বইও কাগজপত্র পড়ে। না হয় পোস্টার লেখে।

দাদাকে চুপ করে থাকতে দেখে অশোক বলে—কি ভাবছিস? চাকরীর কথা? অমৃত ওর দিকে চাইল।

অশোক বলে—কিৎসু হবে না বাবা। এই কাঠামোতে কিৎসু হবে না। তার চেয়ে লেগে পড় আমাদের সঙ্গে, ফিল্ড ওয়ার্ক কর। চাকরী হতে পারে মুরুব্বির জোরে। দ্যাখ না ওল্ড ফুলের চাকরী হয়ে গেল শাঁসালো ছাত্রের দয়ায়। তুই রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিস।

—বাবা কি করবেন? যদি কেউ ডেকে কাজ দেয় তাঁকে?

—কি কাজ সেটা দেখগে? আবার ব্যাটা ছাত্র বোধহয় টের পেয়ে গেছে যে মাস্টারমশাই-এর একটি কন্যেও আছে তাই—

অশোকের কথাগুলো বিশ্রী লাগে অমৃতের কাছে। সে কঠিন স্বরে জানায়।

—থামবি অশোক!

অশোক কাউকে আঘাত করতে পারলে খুশী হয়। তৃপ্তি পায়। ও এখন খুশী হয়েছে অমৃতকে ওই ভাবে চমকে উঠতে দেখে।

অশোক জানায়।

—অবিশ্যি এখন মেয়েদের অভাব আর নেই। বুঝলি ওসব সতীত্ব, শালীনতা—

অমৃত অশোকের দিকে চেয়ে আছে। অশোক বলে চলেছে।

—সমাজের এই কাঠামোটা যত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়ে ততই ভালো। ভাঙ্গুক, আশা স্বপ্ন ভালোবাসা সব মোহ ছুটে যাক। তবেই মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

অমৃতের মনে হয় ঘুরতে ঘুরতে বুকভরা শূন্যতা আর হতাশা নিয়ে সেও জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে।

রাত নামছে। বাবার ঘরে আলো নিভে গেছে। ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। অমৃত ভাবছে ওর কথা। আজীবন বসন্তবাবু যেন উল্কার মত জ্বালা নিয়ে ফিরেছেন। আজ তার উত্তরপুরুষরাও সেই দুঃসহ জ্বালা থেকে মুক্তি পায় নি। এতদিনে তবে পরিবর্তন কি হয়েছে সমাজ-ব্যবস্থায় সেটা মাঝে মাঝে ভাবে অমৃত।

সাবিত্রীর মনের অতলের চাপা পড়া সুরটা কেমন গুনগুনিয়ে ওঠে। ক্লাশ আরম্ভ হবার আগে আসে, বাড়িতেও ভালো লাগে না। তবু গানের স্কুলে এসে দারোয়ানদের নিয়ে ঘর সাফ করে হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা বের করিয়ে আসর সাজিয়ে বসে। দারোয়ান বলে।

—এতো সকাল সকাল এলে সাবিত্রী দিদি?

সাবিত্রীর মনে অকারণে কি লজ্জার আবেশ জাগে। ওই বুড়ো লোকটা বোধহয় জেনেছে তার মনের গহনের দুর্বলতার কারণটা। তাই ওই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বলে সাবিত্রী—এমনিই।

সাবিত্রী কাজলবাবুর ক্লাশ আছে আজ তা জানে। মনের গভীরে তবু একটা খুশীর সুর ওঠে। কেন জানে না সাবিত্রী। তবু তাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই সাবিত্রী আজ কিছুটা সেজেগুজেই এসেছে। সম্বল মাত্র একখানা শাড়ি। সেইটা পরে মুখে ঘাড়ে গলায় একটু পাউডারের প্রলেপ দিয়ে ফিটফাট হয়েছে।

সাবিত্রী বলে—এলাম একটু কাজ ছিল। যন্ত্র-পাতিগুলো সাজিয়ে রাখতে হবে।

—অ।

দারোয়ানরা নীচে নেমে গেছে। একাই রয়েছে সাবিত্রী। ওপাশে হারমোনিয়ামটা নামানো।

কি ভেবে সাবিত্রী হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে আপন মনে সুর তুলতে থাকে। নিজেও একদিন গাইতো। পুরোনো বাড়িটার এঁদো ঘরে বসে একটি মেয়ে এই সুরের আলাপ করেছিল সেদিন কাজলেরও সুর উঠতো সেই বাড়ির প্রান্তসীমার ঘরখানা থেকে। সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়ে সেই সুর শুনতো।

সাবিত্রী গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল তার কাছ থেকেই। ওই সুরের ছোঁয়া আজও তার মনকে ভরিয়ে রেখেছে। আজকের সুরে সেই স্মৃতিই জেগে ওঠে।

হঠাৎ সুলেখাদির ডাকে খেয়াল হয়। কতক্ষণ গান গাইছিল জানে না সাবিত্রী। সুলেখাদি এসে পড়েছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়েও বোধহয় সাবিত্রীর গানও শুনছিল। ওকে দেখতে পেয়ে সাবিত্রী থেমে গেছে, লজ্জায় ওর মুখ রাঙ্গা হয়ে যায়। কি একটা গর্হিত কাজ সে করে বসেছে। সুলেখা জানতো না যে সাবিত্রী গান গাইতে পারে। এখানেও ছাত্রী হয়ে আসে নি। এসেছিল সামান্য চাকরী নিয়ে। মাসকাবারি ক'টা টাকার জন্য। সুলেখা দেখেছে মেয়েটিকে। ভালো লাগে তার সাবিত্রীকে। শান্ত ভদ্র। আজ ওর গান শুনে আরও বিস্মিত হয়েছে।

সুলেখা বলে—বাঃ, বেশ চমৎকার গাইছিলে তুমি। আগে গান গাইতে? অস্বীকার করার উপায় নেই। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে সে।

সাবিত্রী মাথা নাড়ে—এক আধটু গাইতাম।

সুলেখা বলে—গান শিখলে সুন্দর গাইতে পারবে। কারোও কাছে শিখেছিলে নাকি?

সাবিত্রী চমকে ওঠে। তার আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। তখন কাজলবাবু সবে দু'-এক জায়গায় গাইছে, রেকর্ড বের হয়েছে একখানা। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলোর কথা ভোলে নি সাবিত্রী। তার সুরের স্মৃতিতে কাজল মিশিয়ে আছে।

কাজলদাই বলতো রেওয়াজ করো। আমিই দেখিয়ে দোব। তবু একটা সাধনা নিয়ে থাকলে পথ পাবেই।

সাবিত্রীও গান গাইবার চেষ্টা করতো।

কাজলদাই তাকে সেদিন শিখিয়েছিল।

সাবিত্রীর সেই আলো-ঝলমল মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে। কিন্তু আজ সেটা

স্বীকার কবার মত ধৃষ্টতা তার নেই। কাজলবাবু আজ অনেক উপরতলাব মানুষ। সাবিত্রীকে সে চেনে না।

ওর সঙ্গে সেই পরিচয়ের কথা শুনে এরা হাসবে ভাববে মিথ্যাবাদী বলে। সাবিত্রী কোন গানের স্কুলের সহকারিণী মাত্র। আজ এই তার পরিচয়। সাবিত্রী সুলেখাদির কথায় মাথা নাড়ে।

—না। এমনি শুনে শুনে গাইতাম।

হঠাৎ কার ভরাটি গলাব শব্দে চমকে ওঠে সাবিত্রী, সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি তরুণ। বলিষ্ঠ চেহারা, পরণে গরদের পাঞ্জাবী আর পায়জামা। বড় দিদিমণিও এসেছেন ওর সামনে। কাজল ঢুকেছে। সে বলে চলেছে স্কুলের অধ্যক্ষাকে।

—আর বলবেন না? গাড়ি চলবারও পথ নেই কলকাতা শহরে। সব জাম। একটা ছবির প্লেব্যাক-এর গান রেকর্ডিং ছিল টালিগঞ্জে। টেক করতে তো ঘেমে নেয়ে ওঠার উপক্রম। তিনখানা গান রেকর্ড করে বের হলাম, কিন্তু কিসের মিছিল চলেছে। পথ বন্ধ। জট পাকিয়ে গেছে সব। উঃ—সেই ব্যূহ ভেদ করে এলাম এতক্ষণে। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

—কি আর করবেন! অধ্যক্ষা সরলাদি এখানে অন্য মানুষ। বুলডগের মত ভারী মুখখানায় হাসির আভাস জাগে।

সাবিত্রী জানে কাজলবাবুর নামেই স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। অনেক ধরে করে ওকে এখানে এনেছে সরলাদি। অন্যদের ত্রুটি হলে ওর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। সরলাদি কড়া ধাঁচের মেয়ে। কোন গলতি সে সহ্য করে না। কারো স্কুলে আসতে দেরী হলে রেগে ওঠে। এখানে সরলাদি বলে কাজলকে আপ্যায়নের সুরে।

—একটু কফি আনাই? না কোকোকোলা—সাবিত্রী! শোনো—

কাজলবাবু বলেন,—তাহলে কফিই। দেখি, ওদিকের ক্লাশে যেতে হবে।

সাবিত্রী থমকে দাঁড়িয়েছে। একটি মুহূর্ত। সরলাদি ওকে দেখে ডাকল।

—সাবিত্রী, নীচে দারোয়ানকে বলো কফির জন্য। যাও।

সাবিত্রী বাধ্য হয়ে সামনে এসে পয়সাগুলো নিলো। একটি মুহূর্ত। মনে হয় সাবিত্রীর তার হাত থেকে পয়সাগুলো পড়ে যাবে।

কাজলবাবুও দেখছে তাকে। ওর চোখ দুটো এক নিমেষের জন্য চকচকিয়ে উঠে। সাবিত্রীর হাত কাঁপছে। মনে হয় কাজলবাবু এখুনিই ডাকবে তাকে। তাদের সেই

পরিচয়ের স্বীকৃতি দেবে। সাবিত্রীরও দাম বেড়ে যাবে এদের সামনে নাটকীয়ভাবে। বুক কাঁপছে তার।

কিন্তু সে সব কিছুই হল না। কাজলবাবু ওদিকের ক্লাশে গিয়ে ঢুকেছে। সরলাদিই কঠিন কর্কশ গলায় বলে ওঠে সাবিত্রীকে।

—এমন হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে? কথা কানে গেল না?

সাবিত্রীর কানে ওই শাসানির সুর একটা সচেতন ভাবকে ফিরিয়ে আনে। ও বিড়বিড় করে বলবার চেষ্টা করে।

—যাচ্ছি দিদিমণি।

সাবিত্রীর সব আশা যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে। ম্লান মুখে সে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। কাজলবাবু তাকে চেনে নি, চিনতে চেষ্টা করেছিল, হয়তো চিনতে চায় নি। আজকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত একটি মানুষ তার অতীতের সেই দুঃখ-বেদনার দিনগুলোকে ভুলতে চায়। তাই সাবিত্রীকে সে চিনতে চাইবে না কোনদিনই।

সাবিত্রী অন্ধকার অতলের বাসিন্দা, তাই তাকে সেই বিস্মরণের অতলেই থাকতে হবে। কাজলবাবু তাকে আজ চিনবে না।

সাবিত্রীর মনে তবু একটা দৃঢ়তা জাগে। এই অবহেলার জবাব তাকে দিতে হবে। চুপকরে নীচে নেমে এল সাবিত্রী।

মনে মনে কঠিন হয়ে উঠেছে সে। সেদিন কাজলের অবস্থার তুলনায় তাদের অবস্থা ভালো ছিল। তার বাবার রোজকারও ছিল অনেক বেশী। মা প্রায়ই কাজলকে ডেকে খেতে দিতেন, কারণ কাজলের বুড়ি মা রোজ রান্নাও করতে পারতো না। কাজল বলতো সাবত্রীকে।

—এভাবে তোমাদের বিব্রত করতে লজ্জা বোধ করি সাবিত্রী।

সাবিত্রী জবাব দেয় নি। সেবার হারমোনিয়াম কিনতে কাজলের কিছু টাকা কম পড়ে। সাবিত্রীই বলেছিল মাকে। সুধাময়ীই জোর করে কাজলকে এক'শো টাকা দিয়েছিলেন।

সেই কাজলবাবু আজ অন্য জগতের মানুষ। এসব কথা তার স্মরণে নেই। থাকার কথাও নয়।

সাবিত্রী তৈরী হয়েছে এবার। কোন বাধা দ্বিধা তার নেই। নিজেই কেটলি নিয়ে কফি এনে কাজলবাবুর সামনে দেয়। বড়দিমণির ঘরে ও বসে আছে। সাবিত্রী তাকে কফির কাপটা তুলে দিল। বোধহয় হাতও কাঁপছিল একটু। তবু কাজল এগিয়ে এসেছে।

সরলাদি কাজলবাবুকে শুধোয়।

—কফি ঠাণ্ডা হয় নি তো?

সাবিত্রী কঠিন ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কাজলবাবু পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে—না। ঠিক আছে। সাবিত্রী সরে এসেছিল। কাজল তাকে চিনতে চায় নি, এটা বুঝেছে সে। অতীতের সব অন্ধকারকে অস্বীকার করে কাজল মুখার্জী আজ নতুন আলোর জগৎকে মেনে নিয়েছে।

সাবিত্রীর সব আশার সুর থেমে গেছে। জেগে উঠেছে সারা মনে একটা কাঠিন্য। বাবার কথা মনে পড়ে। অনেক আঘাত, অবহেলা আর বেদনায় এতদিনের আদর্শবাদী মানুষটি আজ বদলে গেছে। সাবিত্রীও ঠিক তেমনি একটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। সাবিত্রীর মনে হয় গানই শিখতে হবে তাকে। কাজলকে সেও দেখাবে যে সে অযোগ্য নয়।

এমনি দিনে সুলেখাদির প্রস্তাবটা এসেছিল তার কাছে।

সুলেখা অবশ্য নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই সাবিত্রীকে ওই কথাটা জানিয়েছিল। সুলেখাদের বাড়িতে মা আর সে থাকে। মায়ের বয়স হয়েছে, সুলেখাও গান-রেকর্ডিং-টুইশানি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাড়ির কাজও করতে পারে না। তেমন বিশ্বস্ত লোকজনও মেলে না। ফলে বিব্রত বোধ করে সুলেখা মায়ের জন্য।

সাবিত্রীকে দেখেছে সে, বিশ্বাস করতে পারে তাকে। মেয়েটি নম্র-ভদ্র। তাই সুলেখা ক'দিন ভেবে, কথাটা পাড়ে সাবিত্রীর কাছে।

—আমার ওখানে থাকবে, কাজকম্ম একটু দেখবে। গানও শিখবে। যদি আসো ভেবে দেখো। সকালে এসে দুপুরে বাড়ি গেলে—আবার এলে বৈকালে, সন্ধ্যায় ফিরে যাবে। তোমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরও নয় আমাদের বাড়ি।

সাবিত্রী কথাটা শুনে কি ভাবছে। তবু কিছু বাড়তি টাকা পাবে। নিজেরও সুবিধে হবে। গানটা শিখতে পারবে। সেটা বড় কথা গান তাকে শিখতেই হবে, দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। তার জন্য সাবিত্রী আজ সব কিছু করতে রাজী। তাদের বাড়িতে গানের পরিবেশ নেই। গান শিখতে হলে তাকে ও বাড়ি ছাড়তে হবে। তাই জানায় সাবিত্রী।

—কথাটা একটু ভেবে দেখি সুলেখাদি। মাকেও বলা দরকার। বাবা-মা আছেন তাদের মতামত চাই।

সাবিত্রী মনে মনে খুশী হয়েছে। এমনি একটা পথ সে চাইছিল। আজ সেই সুযোগটা সহজেই এসেছে। এটা গ্রহণ করবে সে।

তবু একটু ভেবে দেখতে চায়। সুলেখাদির গানের বাজারে সুনাম আছে। সাবিত্রীও সেটা জানে। সুলেখা সাবিত্রীকে ভাবতে দেখে বলে—বেশ তো। তবে নিজের দিকটাও ভেবে দেখো।

বাড়তি টাকাও পাবে সাবিত্রী সেটা জানে। তাই বলে সে।

—দু'একদিনের মধ্যেই জানাবো আপনাকে।

সাবিত্রী কি ভাবছে। একটা পথ তাকে খুঁজে নিতেই হবে। এভাবে ওই এঁদো বাড়িটার মধ্যে পড়ে পড়ে সে নিজের জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে চায় না। এতোদিনের সেই নিরীহ মেয়েটি এইবার কি কাঠিন্য নিয়ে জেগে উঠেছে। তার নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে সে।

টিনের বাড়ির মানুষগুলোর অভবের সংসারে হঠাৎ যেন একটু স্বাচ্ছল্যের আভাষ জাগে। বসন্তবাবু স্ত্রীর কথাতেই পটলের চাকরীটা নিয়েছেন। তাঁর মত ছিল না, বয়স হয়েছে—বিশ্রাম চান তিনি।

কিন্তু কোনদিনই সেটা জোটে নি তাঁর। তাই আজীবন এইভাবে খেটে চলেছেন।

সকালবেলায় কোনরকমে ভাত খেয়ে বের হতে হয়, ফেরেন সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে। কোনদিন রাত্রি হয়ে যায়।

সুধাময়ী ওর পথ চেয়ে থাকে। ফিরতেই শুধোয়।

—এত দেরী হ'ল?

বসন্তবাবুকে পটল ভালো চোখেই দেখে, তাই দেরী হলে কোম্পানীর গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে যায়।

বসন্তবাবু বলেন সুধাময়ীকে।

—কাজে আটকে পড়েছিলাম।

সুধাময়ী মাসের শেষে টাকাগুলো হাত পেতে নেয়। বেশ কিছু টাকা। স্কুলের মাইনের চেয়েও বেশী। ওর মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির ছায়া।

বসন্তবাবু সেটা বুঝতে পারেন। তবু মনে হয় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে তবু এদের মুখে হাসি ফুটেছে। দিনান্তে চাল ডালের সমস্যাটা মিটেছে।

—অমৃত ফেরে নি? বসন্তবাবু শুধোন।

ইদানীং অমৃতের কাজও বেড়েছে। বাবার টুইশানিগুলোও তাকে দেখতে হয়। সেও কিছু বেশী রোজগার করে।

সুধাময়ী জানায়—অমৃত ছাত্রবাড়ি গেছে।

ভাবনা ওই অশোককে নিয়ে। ইদানীং কলেজ ছেড়েছে সে পাকাপাকি ভাবে। দিনরাত মিটিং, পথের ধারে জমায়েত আর নানা কাজ নিয়ে থাকে।

বসন্তবাবু বলেন।

—অশোককে নিয়েই ভাবনা বড় বেশি, পড়াশোনাও করলো না, দিনরাত দলবাজী আর হৈ চৈ নিয়ে আছে। চারিদিকেই শুনি গোলমালের খবর, ওকে বুঝিয়ে বলো—

সুধাময়ী বলে।

—ওসব বলা কওয়ার বাইরে সে। যা ভালো বোঝে করুক!

বসন্তবাবু চুপ করে কি ভাবছেন, ইদানীং দেখেছেন বাইরে বের হয়ে একটা অশান্তি যেন দানা বেঁধে উঠছে। রাস্তার এদিকে ওদিকে দু'একটা ঘটনা ঘটে। মতামত রাজনীতির লড়াই যেন সমাজের বুকে শক্ত থাবাটাকে গেড়েছে।

তাঁরাও রাজনীতি করেছিলেন অতীতে। সে দিনের সঙ্গে আজকের মানুষের কোনো মিল নেই। কি নিদারুণ ব্যর্থতার আক্রোশে এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সুধাময়ীও কথাটা ভেবেছে।

অশোক সম্বন্ধে তার ভাবনা-চিন্তা সব ফুরিয়ে গেছে।

সাবিত্রীর কথাই ভাবে সুধাময়ী, তাই বলে।

—মেয়ের বিয়ে-থা'র ব্যবস্থা দ্যাখো।

বসন্তবাবুও কথাটা ভাবেন। কিন্তু দু'এক জায়গায় কথা বলে যেটা জেনেছেন সেটা অত্যন্ত বিষাদের তাই স্ত্রীর কথায় বলেন তিনি।

—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

—তবু তো একটা পথ বের করতে হবে? সুধাময়ী জানায়।

সাবিত্রী বাড়ি ঢুকে মায়ের কথাগুলো শুনেছে।

আজ তার নিজের পথ সে নিজেই খুঁজে নেবে। সুলেখাদির কাছেই থাকবে গান শিখবে। কি একটা জেদ তাকে পেয়ে বসেছে।

ওই বিয়ে-থায়ের নামে নিজেকে হত্যা করতে সে পারবে না। একটা মতলবও বের করেছে সে।

মা সাবিত্রীকে দেখে মুখ তুলে চাইল।

—ফিরলি?

সাবিত্রী জানায়—সুলেখাদির বাড়িতে থাকতে হবে মা। উনিই আমাকে গান শেখাবেন। আর লেখাপড়া করে সরকার থেকে গান শেখার জন্য একটা স্কলারশিপও পাইয়ে দেবেন তিনি।

বসন্তবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন। তিনি নিজে পেনসনের জন্য ঘুরে ঘুরে জুতোর শুকতলা খুইয়ে ফেলেছেন। তবু কিছু সুরাহা হয় নি। তাই বলেন।

—স্কলারশিপ দেবে ওরা?

সাবিত্রী নিজের জন্য আজ মিথ্যা কথাটাই জানায়।

—হয়ে যাবে বাবা। কিছু টাকা পাব। বসে বসে নিজেকে নষ্ট করি কেন? তবু একটা কাজের মধ্যে থাকবো।

বসন্তবাবু চুপ করে থাকেন।

সাবিত্রী শোনায়—সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি চলে আসবো।

তবু একটু নিশ্চিন্ত হয় সুধাময়ী। এই সংসারের সব মানুষগুলোই নিজের কথা ভাবে। আর ওই অশোক!

কারো কথা ও ভাবে না—নিজের কথাও নয়।

অমৃত বাড়ি ফিরে সাবিত্রীর খবর শুনে বলে।

—এতো ভালো কথা রে। লেগে পড়।

—বসন্তবাবু যেন ওদের কাছ থেকে সরে সরে যাচ্ছেন। তবু সংসারের প্রয়োজনে তাঁকে চাকরীটা করতে হচ্ছে।

সুধাময়ীর অনেক আশা। মেয়ের বিয়ে দেবে। তারপর নিজেদের জন্যে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করবে। আর বসন্তবাবুকে একটা কাজ করতে হবে। ছাত্র পটলকে ধরে করে যে ভাবে হোক অমৃতের একটা চাকরী করে নিতে হবে।

তাই যেন ওরা সকলে মিলে ঠেলে পাঠাচ্ছে বসন্তবাবুকে চাকরী করতে।

বসন্তবাবু কিছুদিন চাকরী করার পর বুঝতে পারেন পটলের রহস্যজনক কারবারের কিছুটা। তিনিও যেন এইসব গোলকধাঁধার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। ভাবতেও ভয় হয় বৃদ্ধের।

তার এসব আদৌ ভালো লাগে না। পটলের ওখানে কাজ করেন সত্যি, কিন্তু এখনও টের পান নি পটলের আসল ব্যবসা কি? দেখেছেন বোম্বাই থেকে সোনার ছিলা আসে, মিণ্টে সেই সব সোনা জমা দিয়ে ওরা মিণ্টের ছাপমারা সোনার বাট নিয়ে আসে।

এছাড়াও অনেক লোকজন আসে গাড়ি হাঁকিয়ে। ওপাশের বন্ধ ঘরটায় পটলবাবু বসে, ঘরটায় এয়ারকুলার লাগানো। গ্রীষ্মকালেও সেখানে বেশ ঠাণ্ডা। ওই বদ্ধ ঘরে বসে হয়তো অনেক পরিকল্পনা হয়।

—মাস্টারমশাইকো বোলাও।

বসন্তবাবুকে এসে বেয়ারা খবর দেয়—সাহেব ডাকছেন।

বসন্তবাবুর বিশ্রী লাগে এটা। দেখেছেন তিনি বাইরের ওই বিদেশী অন্য লোকদের সামনে তাকে বসতেও বলে না পটল। সেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা গড়ে তুলেছে। বসন্তবাবুকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পটল যেন ইচ্ছে করেই বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে সে নিজের প্রাধান্যের কথা জানাতে চায়।

পটল বলে—এর সঙ্গে একবার যান। কিছু জিনিসপত্র আসবে, সেগুলো এনে উনি যেখানে বলবেন পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

—এখুনিই যেতে হবে?

বসন্তবাবুর কাছে এইসব কাজগুলো কেমন সন্দেহজনক ঠেকে।

পটলও সেটা ক্রমশ বুঝতে পারে। তাই অভয় দেবার জন্য বলে।

—বইপত্র কিছু আসবে। অন্য কিছু নয়। যান।

পটলের কথায় কি যেন ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। বসন্তবাবু গাড়িতে বের হলেন মোটা গোয়ানিজ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে।

বসন্তবাবুও দেখেছিলেন ওই বিদেশী লোকটিকে পটল বেশ কিছু টাকার নোট

দিয়েছে। দু'জনের মধ্যে কি যেন ইশারা বিনিময় হয়ে যায়। কালো মোটা লোকটার সারা দেহে ইয়া লোম। চোখ দু'টো লাল।

গাড়িটা চলেছে চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ফ্রী স্কুল ষ্ট্রিট ধরে আরও কোন সরু রাস্তার দিকে।

বসন্তবাবু একপাশে চুপ করে বসে আছেন। মোটা লোকটার মুখে বিশ্রী মদের গন্ধ ওঠে। ওর চোখ দু'টো লালচে।

বসন্তবাবু গাড়িটা থামতে দেখে চাইলেন।

এঁদো গলি, দু'দিকে পুরোনো বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচমিশেলী পাড়া। গাউন পরে মেয়েরা যাতায়াত করছে। কার মদ্যপ কণ্ঠের হল্লার শব্দ ওঠে।

বসন্তবাবু ঘাবড়ে যান, শুধোন।

—এ কোথায় এলাম সাহেব?

মোটা গোয়ানীজ ভদ্রলোক বলে এদিক ওদিকে চেয়ে নীচু গলায়।

—ডোণ্ট ওরি মিষ্টার। সব ঠিক হ্যায়। আই এ্যাম্ কামিং। ওয়ান মিনিট প্লিজ।

লোকটা নেমে একটা ভাঙ্গা পুরোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাদের জড়িত কণ্ঠে হাসির শব্দ শুনে চাইলেন বসন্তবাবু, একটি মেমসাহেবের কোমর জড়িয়ে ধরে চলেছে একটা মাতাল, ঢুলছে দু'জনেই আর হাসছে।

দুটো মুষকো লোক তার গাড়িটাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে ওপাশের দোকানের ধারে চলে গেল, নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে তারা। বসন্তবাবুর ভয় হয়। পাড়াটা মোটেই ভালো নয় তা বুঝেছেন।

হঠাৎ দেখা যায় একজন লোক এসে ওকে গাড়িতে তিনটে প্যাকেট দিয়ে বলে।

—বুকস্ ফর পটলবাবু। গো-গো নাউ। হুঁসিয়ার লোকটা হাওয়ায় যেন মিশিয়ে গেল।

ড্রাইভারও গাড়ি নিয়ে বের হয়ে আসছে। বসন্তবাবুর হাতে সেই মোড়ক কটা, মনে হয় ওগুলো যেন পাথরের চেয়েও ভারি, বসন্তবাবুর মনে হয় সকলেই তাকে দেখছে। বই বিক্রী করার জন্য এত গোপনীয়তা কেন—কি বই এমন এসব তা বুঝতে পারেন না। তবু পুলিশের গাড়ি দেখলে বুক কাঁপে।

কোনরকমে বই-এর প্যাকেটগুলো এনে পটলের চেম্বারের পৌঁছে দিতে পটল খুশী হয়।

—অনেক ধন্যবাদ মাষ্টার মশাই। রাত হয়েছে গাড়িতেই বাড়ি চলে যান। পৌঁছে দেবে ড্রাইভার। আর—নিন।

পকেট থেকে একমুঠো নোট বের করে দেয় সে বসন্তবাবুকে।

পটল অবশ্য টাকার কার্পণ্য করে না।

কিন্তু এ টাকায় কেমন ভয় হয় বসন্তবাবুর। সুধাময়ীর দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। ওর মনে আরও পাবার আশাটা বেড়ে চলেছে। ও জানে না সেই পাবার আশা মিটোতে গিয়ে বসন্তবাবু কত অন্ধকার অতলে নেমেছেন।

বসন্তবাবু বলেন—টাকা যা পার সরিয়ে রাখো। পয়সার জন্য অনেক কষ্টই পেয়েছো।

সুধাময়ী টাকাগুলো হাত পেতে নেয়।

সুধাময়ী স্বামীকে চুপচাপ থাকতে দেখে শুধোয়—কি ব্যাপার?

চমকে ওঠেন বসন্তবাবু, সেই ভয়টা কাটে নি।

সাবিত্রীকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল সুধাময়ী।

—কি রে? শরীর খারাপ?

সাবিত্রীর চেহারায় একটা উস্কোখুস্কো ভাব ফুটে উঠেছে। মুখচোখে কি চাপা উত্তেজনার আভাস। মাকে দেখে একটু হকচকিয়ে ওঠে সাবিত্রী। কোনরকমে জবাব দিল।

—না। একটু জ্বর জ্বর হয়েছে। বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। সাবিত্রী ওপাশের ঘরে চলে গেল।

মায়ের চোখকে তবু যেন ফাঁকি দিতে পারে না সাবিত্রী। সুধাময়ী একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সাবিত্রী ঘরের ভিতর যেতে সুধাময়ী তিক্ত কণ্ঠে বলে স্বামীকে।

—বারবার তোমায় বলছি। সোমত্ত মেয়ে কবে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। একটা ব্যবস্থা করো।

—দেখি কি হয়?

বসন্তবাবুও কি ভাবছেন। আজ সাবিত্রীকে দেখে তাঁরও ভালো বোধ হয় নি। তাই বলেন চিন্তিত মুখে—

—চেষ্টা তো করছি অমুর মা।

—একটা যা হয় কিছু করো। আমার যেন ভালো লাগছে না বাপু। সুধাময়ীর কণ্ঠে ভয়ের আভাস জাগে।

রাত্রি হয়ে গেছে। সুধাময়ী রান্নাঘরে গেছে, তখনও রান্নার কাজ বাকী। চাও দিতে হবে। বসন্তবাবুকে বলে।

—হাতমুখ ধুয়ে এসো। চা আনছি।

বসন্তবাবু উঠোনের কলতলার দিকে যাবেন, হঠাৎ বাইরে কাদের ডাকাডাকি শুনে বের হয়ে গেলেন। দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

পুলিশ এসেছে।

ভয়ে কাঠ হয়ে যান তিনি। অতীতে এই পুলিশরাই তাদের ভয় করতো। আজ মনে হয় বসন্তবাবুর—পটলের ওই বই আনার ব্যাপারে কিছু সাংঘাতিক গোলমাল হয়েছে, তাঁকেও খুঁজতে এসেছে পুলিশ।

না হয় কারখানার কাঁচামাল বে আইনীভাবে বিক্রীর চালান কেটেছিলেন তাই ধরা পড়ে গেছে।

—পুলিশের অফিসার ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনে বসন্তবাবু একটু সাহস করে এগিয়ে আসেন।

—অশোকবাবু এখানেই থাকে তো?

অশোককে খুঁজতে এসেছেন তাঁরা। বসন্তবাবু মাথা নাড়েন। কোনরকমে জানান।

—এখন বাড়িতে নেই।

—এলে থানায় যেতে বলবেন একবার।

ওরা চলে গেল। বসন্তবাবু কোন রকমে ভিতরে এসে হাতে মুখে জল দিয়ে বসলেন দাওয়ায়। সেই ভয়টা এখনও যায় নি।

মন হয় পটলের ওখানের অন্ধকার অনেক ব্যাপারেই তিনি জড়িয়ে পড়েছেন।

ওসব ছেড়ে চলে আসবেন, নীতি-আত্মসম্মানে বাধছে এবার।

কিন্তু সংসারের প্রাণীগুলোর সেই অর্দ্ধাহার, অনাহারের কথা ভেবেও আজ পারেন না।

সাবিত্রীর গুনগুন সুর শোনা যায়। সুধাময়ী নিশ্চিন্ত মনে রাঁধছে। অমৃত তবু কিছু বেশী টুইশানি করে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পেরেছে। টাকাও কিছু আসছে।

তিনি এই কাজ ছেড়ে দিলে সব আবার কি অভাবের ছায়ায় কালো হয়ে যাবে।

সুধাময়ী চায়ের কাপটা রেখে গেছে কখন, খয়াল নেই বসন্তবাবুর। চা'টা জুড়িয়ে গেছে।

মনের অতলের একটা জড়তা ভয়ের রূপ নিয়ে তার সব চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

বসন্তবাবুর কাছে এই ভয়টা যেন কালো ছায়ার মত ঘনিয়ে আসছে। মনে হয় পটলের ওই কারখানা-টারখানা একটা বাইরের আচরণ মাত্র। সেখানেও নানা গোলমাল রয়ে গেছে। বসন্তবাবু কয়েকমাসের মধ্যে তা টের পেয়েছেন।

পারমিট আসে। সেই পারমিটের মালপত্রই বেচে দেয় তারা, আর তাতে যা লাভ হয় বিনা মূলধনে কারখানায় মাল তৈরী করেও তা হয় না। আবার অন্ধকার পথে সেই মালই দ্বিগুণ দামে কেনা হয়ে কারখানার খাতায় জমা হয়। সব জেনে তাই পটলকে সেদিন বসন্তবাবু বলেছিলেন—এটা যে ঘোরতর অন্যায় বাবাজী। বেআইনী কাজ।

পটল ওর দিকে চেয়ে থাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। দীঘির পাড়ের মিত্তির বাড়ির হ্যাংলা ছেলেটার লোভ-লালসা আজ আকাশ ছুঁয়েছে। পটল বলে ওঠে।

—ওসব কথা আপনি ভাববেন না। যা করতে বলা হচ্ছে তাই করবেন। হ্যাঁ— আপনার এ মাসের রাহাখর্চা বাবদ একশো টাকা আগাম রেখে দেবেন। ক্যাশে বলা আছে। যান ওগুলো চালান করে নেবেন। আর সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে যাবেন গাড়ি নিয়ে—একজন মাছের কারবারী কিছু ইলিশ মাছ দেবে, নিয়ে এখানে দিয়ে যাবেন।

বসন্তবাবু মাছও আনেন প্রায়। এত আক্রাগণ্ডার দিনে পটল পাঁচ-সাতটা করে ইলিশ মাছ আনে। আর নৌকোও সব যেন চেনা। তার গাড়ি দেখেই তারা এগিয়ে এসে আপনা থেকেই তুলে দেয়।

বসন্তবাবু এবার ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখেন। তাই ভয় হয়।

তিনি বলেন।

—মাছটা ড্রাইভারই আনতে পারবে। ওর তো চেনা।

পটল বলে।

—না আপনিই যান। ও যেন কি বুঝেছে। তবু সহজভাবে বলে পটল।

—বাঙ্গলাদেশের ছেলে কিনা, তাই ইলিশ মাছের লোভটা সামালাতে পারি না।

বসন্তবাবু মাছও আনেন প্রায়, কোনদিন বই-এর প্যাকেটও আসে, ঝকঝকে কাগজে মোড়া সব মোটা মোটা বই। বসন্তবাবুও প্রথমে অবাক হয়েছিলেন।

—এতো সব বই আনাও পটল?

পটল ওঁকে দেখতে থাকে। ওঁর এই কথাটা তার ভালো লাগে নি। মাঝে মাঝে বুড়ো লোকটা সব কিছুর খোঁজ খবর নিতে চায় আগ্রহের সঙ্গে। এটাকে ভালো চোখে দেখে না পটল।

তার কাজ কারবারের অন্ধকার দিকটাকে সে গোপন রাখতে চায়। সেটা নিয়ে কেউ বেশী নাড়াচাড়া করুক এটা সে পছন্দ করে না। বসন্তবাবুও অবাক হয়েছেন পটলের চোখ-মুখের চেহারা বদলে যেতে। মনে হয় তাঁর অসাবধানে একটা কথা তিনি বলেছেন যেটা পটল আদৌ পছন্দ করে নি।

পটল জবাব দেয়—একটা লাইব্রেরী আছে আমার, তার জন্য কিছু বইপত্র আনাই বিদেশ থেকে।

বসন্তবাবু আরও অবাক হন। পটল ইংরেজিতে ছিল একেবারে কাঁচা। দুয়ের ঘর ছাড়িয়ে নম্বর উঠতো না। টেনে হিঁচড়ে থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছিল অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। সেই পটল কিনা পড়ায় এতো মন দিয়েছে এখন, এটা বিশ্বাসও করতে পারেন না তিনি।

চুপ করে থাকেন। এর মনের গভীরে সেই কালো ছায়াটা সব আলোকে গ্রাস করেছে। মনে হয় ওর চাকরী ছেড়ে দেবেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেন নি সারা জীবন। আজ শেষ বয়সে সমাজের এই ভাঙনের মাঝে তাঁকে ওরা বাধ্য করেছে সব হারাতে। এ যেন তাঁর অপমৃত্যু। তিলে তিলে এর বেদনা তাঁর মনের সব প্রসন্নতাকে গ্রাস করেছে।

বলেন তিনি সুধাময়ীকে।

—মাঝে মাঝে মনে হয় এসব ছেড়ে দিই অমুর মা।

সব কথা বলতে পারেন না বসন্তবাবু স্ত্রীকেও। এ যেন অন্ধকার নরকের কাহিনী। সুধাময়ী তা জানে না। ও ভাবছে তার সংসারের কথা। তাই বলে।

—আরও কিছু দিন চালাও, মেয়েটার বিয়ে-থা দিই। অমুর একটা চাকরী-বাকরী হোক, শহরের আশেপাশে ছোট্ট একটা মাথা গোঁজার মত বাড়ি করো—

হাসছেন বসন্তবাবু, ওদের চাওয়ার শেষ নেই।

এই চক্রে তাকে বেঁধে রেখেছে তারা। সেদিনের বিপ্লবী মানুষটার আজ নিঃশেষ অপমৃত্যু ঘটেছে।,

রাস্তার দিক থেকে গোলমালের শব্দ শোনা যায়।

বসন্তবাবু খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। অমৃত তখনও ফেরে নি। অশোক যেন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বসন্তবাবু ওই গোলমালে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। কোন মিছিল যাচ্ছিল, হঠাৎ ওদিক থেকে কলরব ওঠে। বাধা দিয়েছে অন্য দল। তাই নিয়ে গোলমালের শব্দ শোনা যায়।

চমকে ওঠেন বসন্তবাবু। দেখেছেন এই গোলমাল শহরের সর্বত্র। এতদিন ধরে একদল মানুষ সমাজ-ব্যবস্থাটাকে উল্টে দেবার নাম করে অনেক গালভরা কথার তুবড়ি ছুটিয়েছে, সাধারণ মানুষকে অনেক কিছু আপ্‌সে পাইয়ে দেবার আশা দিয়ে তাদের নিজেদের দলে এনে ক্ষমতা অর্জন করেছে।

কিন্তু তাদের সেই লোভ আর শক্তিমত্তার প্রকাশ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠে সমাজের সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেছে। কথায় কথায় সব কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজ ট্রাম-বাস বন্ধ, দোকানপাট খুলতে পারে না, ওদিকে একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এসেছে হতাশার অবসাদ, খেটে খাওয়া মানুষ অনেক আশা করেছিল—সেই আশার কোনটাই পূরণ হয় নি। বরং দুঃখ-দুর্ভোগ বেড়েছে।

তারই প্রতিবাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে সমাজের স্তরে স্তরে। সারা শহরের এলাকা ছাড়িয়ে সারা দেশে এরই প্রকাশ, তাই শক্তিমত্ত সেই মানুষগুলোও মরীয়া হয়ে উঠেছে।

—কিসের গোলমাল শুনছি? সুধাময়ী চমকে ওঠে।

বসন্তবাবু বলেন—ওতো লেগেই আছে।

তবু চীৎকার বেড়ে চলেছে।

পাড়ার লোকও সতর্ক হয়েছে।

হঠাৎ কড়াটা কে নাড়ছে। দরজা খুলে দিতে অমৃত বাড়ি ঢুকলো। চোখে মুখে তার উত্তেজনার আভাস। সেই-ই জানায়।

—কি সব গোলমাল বেধেছে মিটিং-প্রসেশন নিয়ে। লোকজন ছুটোছুটি করছে।

সুধাময়ী জ্বালাভরা সুরে বলে।

—ওই নিয়েই থাকবে ওরা? এদিকে সাধারণ মানুষের যে দম ফুরিয়ে আসছে দিন চালাতে, তার জন্য কেউ কিছু করেছে?

এটা তাদের সকলেরই প্রশ্ন। অমৃতও ভেবেছে সেটা। দরজায় দরজায় ঘুরছে চাকরীর সন্ধানে। দু'-একটা ইন্টারভিউও পেয়েছিল। হাজির হয়ে এসেছে ওই পর্যন্ত। কিছু হয় নি।

এক জায়গাতে তো সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল তাকে কোনো কর্তাব্যক্তি।

—কোন্ দলের হয়ে রাজনীতি করেন?

অর্থাৎ ওটাও তাঁদের জানা দরকার। অমৃত জানিয়েছিল।

—ওসব করি না।

ভদ্রলোক একটু হতাশ হয়ে শুধোন।

—কেন? আজকের দিনে রাজনীতি এড়িয়ে থাকা যায় না। তাছাড়া ইয়ং ম্যান, ওসব তো করে থাকে।

অমৃত ওর দিকে চাইল। মনে হয় ওঁরা অমৃতের ওই জবাবে খুশী হন নি, ওঁদের মনে হয়েছে অমৃত মিথ্যা কথা বলছে।

কিন্তু অমৃতের জীবনের জ্বালাটাকে ওঁরা বোঝেন নি, তাই ভাবতে পারেন নি যে অমৃতের ওই কথা কতো সত্যি।

অমৃত দেখেছে তার আশেপাশের মানুষগুলোকে। তার বাবার সেই বলিষ্ঠ চরিত্রেরও অপমৃত্যু ঘটেছে। অতীতের সেদিনের ত্যাগ-এর কোন মর্যাদাও আজ নেই।

দেখেছে অশোককে। ভালো ছাত্র ছিল। পড়াশোনা করলে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেতো, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে ভর্তি হয়ে এতোদিন এম-এ পাশ করে একটা ভালো কাজও পেতো। কিন্তু তা হয় নি। ওই বিষে তার সব গেছে। সংসারের প্রতি অসহায় মা-বাবার জন্যও তার বিন্দুমাত্র কর্তব্য নেই। ও যেন একটা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সত্তায় পরিণত হয়েছে ওই রাজনীতির আবর্তে পড়ে।

অমৃত তাই ওই পথটাকে মেনে নিতে পারে নি। ওই ভদ্রলোকের কথায় অমৃত জবাব দেয়।

—এ বিষয়ে আমি বার্ণাড শ'র সঙ্গে একমত স্যার।

ভদ্রলোক ওর দিকে চাইলেন। মনে হয় শ'-এর নাম এই প্রথম শুনলেন তিনি।

অমৃত বলে।

—তিনি বলেছিলেন, Politics is the last resort of the Scoundrals.

ভদ্রলোকের মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

অমৃত সেখানে চাকরী পায় নি। অবশ্য না পেয়ে ভালোই হয়েছে। ভদ্রলোকেরও বর্তমানে চাকরী নেই, তাদের কারখানাও বন্ধ বেশ কিছুদিন থেকে।

অমৃত শান্তিতে খেটেখুটে দু'মুটো অন্ন জোগাড় করে বাবা-মা-বোনকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল ওই তার অপরাধ। তাই আজও তার কোনো গতি হয় নি।

সুধাময়ী কান পেতে ওই গোলমাল শুনছে। দু-একটা বোমার শব্দ ওঠে। ওপাশের ফ্যাক্টরীর গেটের ওদিক থেকে সেই গুরুগম্ভীর আওয়াজটা আসছে। অন্ধকারে কেঁপে ওঠে আকাশ বাতাস।

সুধাময়ী বলে।

—সেই হতচ্ছাড়াকে দেখেছিস ওখানে? কোথায় গেল সেটা? মায়ের মন তবু কাঁদে অশোকের জন্যে।

অমৃত ভিড় আর গোলমাল দেখে সরে এসেছে। তাই জানায় মায়ের প্রশ্নে।

—না। ওখানে দাঁড়াই নি।

অন্ধকারে আতঙ্কিত ক'টি প্রাণী কি ভাবছে। বাড়ির আলো নেভানো। চিৎকার উঠছে ওদিকের মাঠে, রাস্তায়।

সাবিত্রী ও জেগে উঠেছে। ঘুম তার আসে নি। তার মনে অনেক চিন্তার আনাগোনা। এর আগে সাবিত্রীর জীবনে কোন জটিলতা ছিল না। অভাব ছিল সত্যি, সংসারের অভাবের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছিল—তাই জীবনের অন্য যন্ত্রণা, বঞ্চনাগুলোকে বড় করে দেখে নি। আজ সংসারের অভাবের সেই জ্বালাটা কমেছে; বাবাও বেশ টাকা-পয়সা আনছেন।

তাছাড়া সাবিত্রী নিজেও এখন সুলেখাদির ওখানে থেকে গান শিখে কাজ করে যা রোজকার করছে সেটা স্কুলের চাকরীর থেকেও বেশী।

সাবিত্রীর মনে কি আশার আশ্বাস জেগেছে। নিজের পথ সে করে নেবে। ক্রমশঃ মনে হয় জীবনটা সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে আবার।

আর একজনের স্বপ্ন তার মনের নিভৃতে এখনও খানিক সাড়া তোলে।

সাবিত্রী যেন অমনি আবেশময় কোন মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিল।

হঠাৎ প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে চমকে ওঠে সাবিত্রী। পর পর কয়েকটা বোমা ফাটল ওদিকের রাস্তার মোড়ে ফ্যাক্টরীর গেটে, কাদের আর্তনাদ—কলরব—শোনা যায়।

সাবিত্রী অজানা ভয়ে ওঘর থেকে এদিকে এসে মা বাবা দাদাকে দেখে চাইল।

জানলাটা খোলা, বাইরে কোথাও এতটুকু আলো নেই। গলির সব বাড়ির মানুষগুলো আলো নিভিয়ে কি ভয়ে মুখ বুজে চুপ করে আছে।

গলির পথ-এর সব আলোগুলো নেভানো। তখনও চীৎকার আর দৌড়াদৌড়ির শব্দ শোনা যায়।

একদল পশু কি হিংস্রতা নিয়ে আবার যেন আদিম অন্ধকারের বুকে তাদের রাজ্য গড়ে তুলতে চায়।

সুধাময়ী বলে ভীত আর্তকণ্ঠে।

—জানালাটা বন্ধ করে দে অমৃত।

থেকে থেকে বোমা ফাটার শব্দ ওঠে বু-ম্-ম্—বু-ম্-ম্।

বসন্তবাবু নির্বাক হয়ে গেছেন।

মনে হয় এ যেন চির অন্ধকারের রাত্রি, এই তমসার বুকে কোন যাদবকুল আজ কলির শেষ প্রান্তে এসে আবার একটি বেদনার্ত যুগাবসানের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা শুরু করছে এই আত্মহননের মধ্যে।

সেই গোলমাল কমে আসছে, বোধহয় আক্রমণকারীর দল কাজ সেরে লুকিয়ে পড়েছে। চাপা ফিস্ ফিস্ শব্দ—পায়ের সাড়াগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে।

কড়াটা নড়ে ওঠে চেনা ছন্দে। তবে খুব সাবধানে ওই শব্দটা উঠছে তা মনে হয়। সুধাময়ী উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

বলে সে—অশোক!

অমৃত জানালার ফাঁক দিয়ে কি দেখবার চেষ্টা করে—কার গলার শব্দ শোনা যায়। সুধাময়ীই গিয়ে দরজা খুললো সাবধানে।

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে অশোক ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়াল। তখনও

হাঁপাচ্ছে অশোক। জামায় পায়জামায় কাদার দাগ। মাঝে মাঝে রক্তের ছোপও গাঢ়তর হয়ে লেগে আছে। ওর আদিম বন্য দুচোখ যেন জ্বলছে কি হিংস্রতায়। গোঁফ দাড়ি ঢাকা মুখে একটা নৃশংসতা ফুটে উঠেছে।

সুধাময়ী চমকে ওঠে—কি করে এলি বাঁদর!

অশোক ধমকে ওঠে—চুপ করো।

বসন্তবাবু দেখছেন ছেলেকে। তিনিও এই জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কোনদিন এমনি আত্মহননের পথে এগোন নি। তাদের শত্রুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন।

অশোক সদর্পে জানায়।

—ওরা হামলা করেছিল ওদিকের ক্যাম্পে, আমরাও ছাড়ি নি। ওদের এখানেই চোট করেছি। হয়তো লাশ দাখিলও হয়ে গেছে ওদের।

ওরা আত্মহননকে গৌরবান্বিত করে তুলতে চায় পুণ্যতম কর্তব্য বলে। তাদের মতকে এমনি রক্তস্নানেও চিহ্নিত করে রাখবে।

বসন্তবাবু অবাক হন আজকের এই উন্মাদনাকে প্রত্যক্ষ করে। তাঁর কাছে এটা নিছক উন্মাদ হিংস্রতা বলেই বোধ হয়।

ঘৃণাভরে শুধোন তিনি অশোককে।

—এই তোদের দেশসেবা, সমাজসেবা, রাজনীতি করা? মতের অমিল হলে লড়াই করেও তাকে মুছে ফেলতে হবে?

অশোক হাতের রক্তটা পকেটের নোংরা রুমালটায় মুছতে মুছতে বাবার দিকে চাইল। বুড়ো লোকটাকে সে মৃত অতীতের প্রেতাত্মা বলেই ভাবে। ও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়তই ধুঁকছে আর আপোস করে চলেছে কাঙ্গালীর মত বাঁচার সেই সুযোগটুকু পাবার জন্য।

অশোক জানায়।

—এ তুমি বুঝবে না। বুঝতে পারবে না। তুমিও সুবিধাবাদীর দাস। নইলে এতদিন বিপ্লবী সেজে আজ শেষ বয়সে মুখোশ খুলে ওই নোংরা পটল মিত্তিরের পা চেটে খাও? লজ্জা করে না—এভাবে বেঁচে থাকতে?

সুধাময়ী ছেলের কথায় শিউরে ওঠে।

—অশোক! কি যা তা বলছিস?

বসন্তবাবু বিবর্ণ চোখে চেয়ে থাকেন অশোকের দিকে।

অশোক জবাব দেয়।

—ঠিকই বলছি। এটা তবু জেনে রাখ—যাদের মরারই কথা, ওই ভাবে বাঁচার চেষ্টা করেও তারা বাঁচতে পারবে না। কোন লাভ নেই ওতে।

অমৃত অশোকের দিকে চেয়ে আছে। সাবিত্রী শিউরে উঠেছে অশোককে ওই অবস্থায় দেখে। জামাটা রক্তাক্ত ছেঁড়া, স্যাণ্ডেলটা নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে।

অমৃত বলে।

—তাই গুন্ডামী করতে হবে?

অশোক হাসল। ও জানায় অমৃতকে তীব্র কণ্ঠে।

—তোদের মত গুড বয় তো একে গুন্ডামীই বলবে। কারণ আমি ওসব দুর্বলের নীতিকে মানি না। আশা করিস ওই শান্তি আর চাকরী পাবি। সাবিত্রীও তো বেশ নাকি নাম করছিস গানে। তোরা এইবার টাকা-নাম-যশ পাবি, লভ-টভও করবি। এই নিয়েই তোদের জীবন, আর আমি ওকে বলবো মোহ নিয়ে বেঁচে থাকা, ওটাকে ঘৃণা করি। ওই কাঁচের মিনারটাকে তাই ভেঙ্গে ফেলে আসল মানুষটাকে চিনতে চাই। তাই তোরা তো গুন্ডা বলবিই আমাকে।

সুধাময়ী কি বেদনায়—জ্বালায় কাঁদছে। সব কিছু তার যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

অশোক তা বুঝল না।

তাই সুধাময়ী বলে।

—এই ভাবে মরবি তুই?

—তার আগে লড়ে যাবো।

বসন্তবাবুর ছেলেকে দেখছেন। ওর চোখে শুধু ঘৃণা আর জ্বালা। সবকিছুই তার চোখে বিষিয়ে উঠেছে।

বসন্তবাবুর সামনে ওই ছেলেটা আজ নিষ্ঠুর কাঠিন্য নিয়ে জেগে উঠেছে।

হঠাৎ অন্ধকারে বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ ওঠে। কারা যেন ছুটে আসছে এই দিকে।

অশোক চকিতের মধ্যে চমকে ওঠে। তৈরী হয়েছে সে।

পকেটে হাত দিয়ে কি বের করার চেষ্টা করে থামলো। পায়ের শব্দটা এগিয়ে আসছে। অশোক এদিকের দরজাটা খুলে চকিতের মধ্যে অন্ধকারে বের হয়ে উঠোনের ওদিককার পাঁচিল টপকে ওপাশের সরু অন্ধকার গলি দিয়ে বের হয়ে গেল।

বসন্তবাবু চুপ করে দেখছেন ব্যাপারটা।

তাঁর জীবনেও এমনি ব্যাপার একাধিক বার ঘটেছিল, কিন্তু সেদিন তাঁদের আদর্শ ছিল ব্রতের মতই, নিষ্ঠার সঙ্গে সেটা পালন করতেন।

আজ সাধারণ মানুষের চোখে ওরা শুধু আতঙ্কের ভাবমূর্তি গড়েই প্রাধান্য কুড়োতে চায়। মানুষের জন্য—দেশের জন্য—কোন আর্দশের জন্য শ্রদ্ধা নেই—সাধনা নেই। তাই সব কিছুর মূল্যমান হারিয়ে গেছে, পর্যবসিত হয়েছে সব কিছু দুঃসহ বেদনার গ্লানিময় দৈন্যে।

—দরজা খুলুন!

কারা দরজায় ধাক্কা মারছে। বোধহয় পুলিশের লোকই।

সেদিন তেজস্বী বিপ্লবী বসন্তবাবু আজ ভীতত্রস্ত একটি প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

অমৃত দরজাটা খুলে দিতেই পুলিশের লোকজন এসে ঢুকল। কে প্রশ্ন করেন।

—অশোক আছে?

—না।

কে বলে—তাকে দেখলাম এই দিকে দৌড়ে আসতে।

অমৃত জানায়—খুঁজে দেখুন। এখানে সে আসে নি।

—নেই।

ওরা এদিক ওদিক খুঁজে টর্চের আলো ফেলে অন্ধকার উল্‌সেও কিছু পেলেন না। অশোক ত্রিসীমানাতেও নেই।

সুধাময়ী সাবিত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরাই জানায়—ওদিকে কারখানার গেটে নাকি দাঙ্গা—বোম চার্জ করে ওরা এই দিকেই এসেছিল। দু'একজনকে ধরেছে পুলিশ, অশোকের কোনো পাত্তাই পায় নি।

ওরা চলে গেল শুধু হাতে।

সুধাময়ীর মুখে ভয়ের বিবর্ণতা।

হঠাৎ সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—কি হবে?

বসন্তবাবু কি ভাবছেন। স্ত্রীর কথায় কি বেদনার্ত স্বরে বলেন।

—ওর জন্য দুঃখ করো না বড় বৌ। সংসারের ও কেউ নয়। কারোও জন্য ও ভাবে না। ওরা বিধাতার কোন বিচিত্র সৃষ্টি। হয়তো হাউই-এর মত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওরা। এই সর্বনাশের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ আমারও জানা নেই।

সংসারের ক'টি প্রাণী কি নির্বাক ভাষাহীন হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

সাবিত্রী তবু এই অন্ধকার জগতে বাঁচার সাধনা করে চলেছে।

অশোকের সেই চলে যাবার পর এ বাড়িতে একটা স্তব্ধতা নেমেছে। বাবাকে দেখেছে সাবিত্রী যেন বাজপড়া একটা মানুষ।

তবু কাজ করে চলেছে।

মাও চুপ করে গেছে।

সাবিত্রীর মনে হয় এভাবে বাঁচা যায় না। তাই বাইরের জীবনটাকে সে আরও নিবিড় করে পেতে চেয়েছে সবকিছু ভোলার এই যেন একমাত্র পথ।

সাবিত্রীও ক'মাসে সুলেখাদির সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সুলেখাদির মাকেও ভালো লাগে তার। তার মায়ের মত অভাবের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে আংরা হয়ে যায় নি।

সুলেখাদির বাবা ছিলেন পদস্থ কর্মচারী। তিনিই পূর্ণদাস রোডের বাড়িটা তৈরী করেন। তার দুটো ফ্ল্যাট থেকে যা ভাড়া আসে তাতেই ওদের দুটি প্রাণীর সংসার ভালোভাবে চলে যায়। তাছাড়া ওর বাবার জমানো টাকার অঙ্কটাও কম নয়, সেটা অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত ব্যাঙ্কে পড়ে আছে।

সুলেখাদি যা রোজকার করেন গান গেয়ে সেটাও অনেক। স্বচ্ছল সংসার।

সাবিত্রীর এখানে করার বিশেষ কিছুই নেই। গান গাইবার অবকাশ পায় অনেক।

ঝি-চাকর আছে, তাদের তদারক করতে হয়। মাঝে মাঝে দু'-এক পদ রান্না করে কোন কোন দিন, না হয় মাসীমার সঙ্গে গল্প করে, কাগজ পড়ে আর বাকী সময়টুকু গান নিয়েই থাকে।

ক'মাসে সাবিত্রীর দেহমনে ফুটে উঠেছে সেই নিশ্চিন্ততার ছাপ, তিলজলার আধা বস্তির মালিন্য ওতে নেই।

সুলেখাদি বলে—ওই সব ক্যাটকেঁটে শাড়ি পরবে না সাবিত্রী। একটু ছিমছাম হয়ে থাকবে।

সুলেখাও ওকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মেয়েটি ভালো। বিনয়ী। সুলেখার মাকে দেখার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। নিজেও এইবার সময় পেয়েছে। তাই সুলেখাই ওকে সব সুখ-সুবধিা দিয়ে এখানে আটকে রাখতে চায়। বলে।

—আজ শাড়ি খানকয়েক কিনে আনবে আমার সঙ্গে গিয়ে। আর জামাটামা যা লাগে নেবে, একজোড়া ভালো স্লিপারও কিনবে। ওই ক্ষয়ে যাওয়া ময়লা স্লিপার পরো কি করে?

সাবিত্রী হাসল মাত্র।

সুলেখাদি তাদের জীবনের কঠিন দারিদ্র্যটাকে দেখে নি, ওদের বেঁচে থাকার সংগ্রামটাও তার অজানা। তাই ওকথা বলে।

সাবিত্রী এখানের পরিবেশে আবার সুরের সন্ধান পেয়েছে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দিনের ছবিটা। পরণে সাদামাটা শাড়ি, নিরাভরণ হাত দুটোয় কফির পট ধরা, সেই অতি সাধারণ মেয়েটিকে চিনতে পারে নি কাজল মুখার্জি, এককালে ওর জীবনে সাবিত্রীই ছিল প্রথম নারী। তার সেদিন শূন্য বঞ্চিত সংগ্রামী জীবনের কামনার পাত্র প্রীতি-সুধারসে ভরে দিয়েছিল ওই হতদরিদ্র সাবিত্রীই।

আজ তার কোনোই দাম নেই।

সাবিত্রী তাই নিজেকে আজ গড়ে তুলতে চায় নীরব সাধনার মধ্য দিয়ে। বাড়িতে যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু ওদিকের পথ যেন নিরাপদ নয়। প্রায়ই বোমা গুলি চলে। মানুষগুলো যেন মেতে উঠেছে।

তাই সাবিত্রী এই অঞ্চলের শান্ত পরিবেশে নিজের সাধনায় ডুবে সব ভুলে থাকতে চায়। ওবাড়ির বিরক্তকর পরিবেশ থেকে সরে থাকতে চায়। তাই এই দুস্তর সাধনা। সুলেখাদিও অবাক হয়। বলে সে।

—সুন্দর রেওয়াজি গলা তোমার। গান শিখলে অনেকের চেয়ে ভালো গাইবে। নিষ্ঠা আছে তোমার।

সাবিত্রী বলে।

—এর সব কৃতিত্ব আপনারই পাওনা সুলেখাদি। না হলে ঝি-গিরি করছিলাম স্কুলে, আপনার চেষ্টাতে এটুকু হয়েছে। রেডিওতেও চান্স পেয়েছি।

সাবিত্রী এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। ওর কৃতিত্বে সুলেখাও খুশী হয়। সাবিত্রী তারই আবিষ্কার। তার দূরদৃষ্টি মিথ্যা হয় নি।

সাবিত্রী যেন নিজে থেকেই তাদের বাড়ির পরিবেশ থেকে সরে যাচ্ছে। পোশাক-আশাক, চালচলন—কথাবার্তাতে এসেছে পরিবর্তন। একটা সুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেয়েছে সে।

তবু বাড়ি যায় সন্ধ্যার পর। সুধাময়ী ক্ষুব্ধ হয়েছে মেয়ের এই পরিবর্তনে। হয়তো মনে মনে ভয়ই পেয়েছে। কারণ জেনেছে সুধাময়ী সাবিত্রী এই জীবনটাকে মেনে নিতে পারে নি কোনদিনই। আর ওখানের দিন ফুরিয়ে গেলে এই পরিবেশে ফিরে এসে মানিয়ে নিতে পারবে না। সেই কথা ভেবেই বলে সুধাময়ী।

—চাকরী করবি বলে কি সব সময়ই সেখানে থাকতে হবে? বাড়ির কথাও ভুলে যাবি?

সাবিত্রী মায়ের কথায় একটু অবাক হয়। মা বোধহয় অন্য কিছু ভাবছে তার সম্বন্ধে। তাই বলে সে।

—অনেক কিছুই ভাবতে পারো মা, তবে জেনে রেখো ওসব কিছুই সত্য নয়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তারই জন্য এই কষ্ট স্বীকার করতেই হবে মা।

সুধাময়ী এতো সব খবর রাখে না। মেয়ের জবাবে সে খুশী হয় নি। তাই বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে।

—ওসব জানি না বাপু। এ বাড়ির কান্ডকারখানাই আলাদা। কর্তা যান একপথে, মেয়ে গেল অন্যদিকে। আর ছেলেরা তো তারও অধম। একজন তো কোথায় গেল কে জানে? করুক যার যা খুশী—আমি এসব ভেবে মরি কেন?

সাবিত্রী অবশ্য শুনেছে আরও অনেক কথা।

লতিকা আর নিতাই-এর মায়ের সেই আলোচনাগুলোও তার কানে এসেছে দু'একদিন। কলতলা থেকে শুনেছিল সেদিন লতিকা বৌদির কথাটা। সাবিত্রীর এই পরিবর্তনটাকে ওরা মেনে নিতে পারে নি। বলে।

—মেয়ের আর কিছু নেই। কোথায় থাকে, কোথায় যায়। কি করে তা আর জানি না? রূপের বাহার দেখেছো।

কথার খেই ধরে বলে নিতুর মা।

—তা আর জানো না বাছা? সংসারের ভোল বদলে গেছে দেখো না? মাছ-

মাংস আসছে। বুড়োর হাড়ে গত্তি লেগেছে। এসব হয় কোত্থেকে? ওই মেয়ের রোজকারে।

লতিকাও সায় দেয়—সেকি আর বুঝি না?

সাবিত্রী বিবর্ণ মুখে ওদের কথাগুলো শুনছে।

নিতুকে দেখেছে সে। ওই বখাটে ছোঁড়াটা তাকে দেখলে শিষ দেয়। হাসে।

নিতুর মা নিতুর সেই কথাগুলো শুনিয়ে চলেছে—নিতুই বলে ওটা বাজে মেয়ে। একেবারে জাহান্নামে গেছে টাকার জন্যে। ওই মা বুড়ো বাপটাও তা জানে। সাবিত্রী নাকি কোন হোটেলে—মাগো মা! কি ঘেন্না! এ বাড়িতে কি যে হচ্ছে?

লতিকা হাসছে খিলখিলিয়ে ওই রসাল আলোচনা শুনে।

সাবিত্রী বাথরুমের চটের পর্দার আড়ালে থমকে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় এসব কথার জবাব দেবে। কিন্তু আগে হলে দিতো, চুটিয়ে ঝগড়াই করতো। এখন ওসব করার মত মানসিক অবস্থা তার নেই। তাই চুপ করে ওই সব কদর্য আলোচনাগুলো শুনে এল।

সাবিত্রী জানে তার মাকে শুনিয়ে শুনিয়েও ওরা এই সব বিশ্রী আলোচনা করে, নানা ইঙ্গিতও করে। মায়ের মন তাই বিষিয়ে উঠেছে।

পাড়াতেও দু'-একজন মেয়ে, গিন্নী ছেলেরাও তাকে দেখে এখন বিস্মিত। হয়তো নীরব ঘৃণাভরা চাহনীতে চেয়ে থাকে। তার অর্থ আর উদ্দেশ্য জেনেছে সাবিত্রী।

ঘরে বাইরের এই আঘাত। ওদের বিষিয়ে ওঠা কথাগুলো কাজলের নীরব অবহেলা সাবিত্রীর সারা মনে একটা নির্জন নিঃসঙ্গতা এনেছে। এনেছে তীব্র বেদনার জ্বালা।

মায়ের ওই ইঙ্গিতটাও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সাবিত্রী সব কিছু সহ্য করে চলেছে। আর এগিয়ে চলেছে তার পথে। একদিন সে প্রমাণ করবে এদের এসব কথা মিথ্যা, অর্থহীন।

সাবিত্রী এসবের অনেক ওপরে।

চটের পর্দাঘেরা বাথরুম থেকে বের হয়ে এল গায়ে মাথায় জল ঢেলে ঠান্ডা হয়ে।

মা সাবিত্রীর দিকে চেয়ে আছে।

মেয়ের সারা দেহে একটা লাবণ্য ফুটে উঠেছে। সাবিত্রীর মনের গহনের একটা উচ্চাশা—শিল্পীর আত্মসম্মানজ্ঞান ওকে ঘিরে একটা যেন বর্ম রচনা করেছে।

সাবিত্রী স্বপ্ন দেখছে—আগামী সপ্তাহে তার প্রথম বেতার অনুষ্ঠান।

মাকে বলে কথাটা—রেডিওতে গাইছি মা!

সুধাময়ী অবাক হয়—তাই নাকি রে?

ও ভাবতেই পারে না সাবিত্রী সত্যি এসব করতে পারে।

বসন্তবাবু বাড়ি ঢুকছেন। ক্লান্ত। তাছাড়া ওঁর মনের অতলের ভালোমন্দের লড়াই লোকটির বাইবের শান্তিটুকুও বিঘ্নিত করেছে।

সাবিত্রীর দিকে চেয়ে থাকেন তিনি।

মেয়েটির মুখে তৃপ্তির আভাষ। বাইরের সম্ভবনাময় জীবনের আলোর ঝলক তার মনকে কি বিচিত্র আলোর বর্ণালীতে ভরে তুলেছে।

বসন্তবাবু এত অন্ধকারেও সেই আলোটুকুকে দেখে খুশী হন। অমৃত এখনও বাঁচার পথ খুঁজছে।

অশোকের কথা মনে পড়ে।

গোলমাল এখন চারিদিকে। কোথায় বোমা ফাটার শব্দ আসে। অশোক ঘরছাড়া, কোথায় আছে জানেন না।

ওরা এই সাধনাকে বিশ্বাস করে না। জীবনের সব সুর ওদের কাছে হারিয়ে গেছে।

সুধাময়ী বলে বসন্তবাবুকে।

—হাতমুখ ধুয়ে নাও, সাবিত্রী বাবার চাটাও নিয়ে আয় এখানে।

এই ছোট্ট ঘরের মোহ—এই মানুষগুলোর জন্য বেদনাবোধ আজ নেই। সাবিত্রী নিজের জগতে হারিয়ে যেতে চায়।

রেডিও প্রোগ্রামটা সেদিন আশাতীত ভালো হয়েছে। সাবিত্রী শুনছিল নিজের গলা, সুলেখাদি বলে ওঠে ওর গান শুনে।

—চমৎকার গায়কী তোমার। গলার কাজগুলোও সুন্দর এসেছে। আমারই হিংসে হচ্ছে সাবিত্রী ওই গান শুনে।

সাবিত্রী বলে—ঠাট্টা করছো লেখাদি?

সুলেখা বলে—ঠাট্টা নয় রে। এবার দেখবি মাসে দুটো করে সিটিং ঠিক আসবে। আর দু'-একটা টুইশানি করে দিচ্ছি। এখানে থাকলে ওগুলো করবি। স্কুলের কাজটা ছেড়ে দে। ওখানে যা দেয় তার চেয়ে বেশী পাবি, তাছাড়া এখন গানের জগতে নাম করছিস—সম্মানের প্রশ্নও জড়িত রয়েছে।

সাবিত্রীও কথাটা ভেবেছে। স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না তার। কারণ ওই ছোট কাজটাকে সে ঘৃণা করে না। ওটার থেকেই এত-খানি উপরে ওঠার পথ পেয়েছে সে, ওখানে যেতে চায় না। কারণ কাজল বাবুকেই এড়াতে চায় সে। কদিন আগেই ঘটনাটা ঘটেছিল।

কাজলবাবু যেন কারণে-অকারণে তাকে ডেকে ফরমাইস করে।

খাবার জল দাও। কফি আনো—সিগ্রেটও আনবে এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক।

তার হাতে পাঁচ টাকার নোট তুলে দেয়।

সাবিত্রীর অসহ্য মনে হয় কাজলের এই ভাবটা। ও তাকে চিনতে চায় না ইচ্ছে করেই বরং অপমান করে। সাবিত্রীর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে।

কাজলবাবু বলে—যাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো যে?

সাবিত্রী প্রতিবাদ করতে গিয়ে পারে নি। কোন রকমে সিগ্রেট কফি এনে মুখ বুজে ওর সামনে রাখে, টাকার চেঞ্জ ফেরৎ দিতে গেলে কাজল অনুকম্পাভরে বলে।

—ওটা তুমিই রাখো।

সাবিত্রী অবাক হয়, মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে সে এই ভেবে যে, কাজল ইচ্ছে করেই ওই টাকাগুলো তাকে যেন ভিক্ষে দিচ্ছে। এই ভিক্ষে নিতে সাবিত্রীর বাধে।

সাবিত্রীর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে অপমানে। দুঃসহ হয়ে ওঠে এই অভিনয়।

ও কিছু বলতে গিয়েই পারল না। কাজলবাবুর কথা শোনে নি এমনি ভাব দেখিয়ে চেঞ্জটা টেবিলের রেখেই চলে গেল।

কাজলবাবুও ওর এই নীরব প্রতিবাদটাকে দেখেছে। তবু হাসতে হাসতে সরলাদিকে বলে সে তাচ্ছিল্যভরে।

--আপনার লোকজন, মেয়ারা কিন্তু খুব অনেস্ট। বকশিশ দিতে গেলাম নিলে না। বোধহয় আত্মসম্মানে বাধে এখনও।

সরলাদি বলে—তাই নাকি! ছিঃ ছিঃ! ওরা সব একদম রাবিশ! ভদ্রলোককে অপমান করা হয় ওতে তা জানে না?

সাবিত্রী!

গলা তুলে সরলাদি সাবিত্রীকে ডাকতে থাকে। সাবিত্রী সবই শুনেছে তবু এগিয়ে গিয়ে বলে শক্তভাবে।

—ওটা নিতে পারবো না সরলাদি, ওঁকে মাপ করতে বলবেন।

সাবিত্রী সরে এল কথাগুলো বলে। কাজল হাসছে। সরলাদি রেগে ওঠে।

সেদিন থেকেই কাজলবাবু যেন বদলে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে ক্লাশে ঢোকার আগে সাবিত্রীকে দেখে দাঁড়ালো।

কি যেন বলতে চায় সে। সাবিত্রীও ওকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য ক্লাশে হাজিরাখাতা নিয়ে ঢুকে গেল। কাজলকে যেন দেখে নি সে।

সেদিন সাবিত্রীর রেডিও প্রোগ্রাম নিয়ে স্কুলে শিক্ষিকাদের মধ্যে ছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা হয়। তাদের অনেকেই ওই সব অনুষ্ঠানের সুযোগ পায় না। আর ওই স্কুলের সামান্য একজন কর্মী কিনা এই চান্স পেয়ে গেল।

যমুনাদি বলে।

—সাবিত্রীও আজকাল গাইছে রেডিওতে? এরপর দেখবো আমাদের দারোয়ানও ঢোলক-কর্তাল নিয়ে চলে গেছে রেডিওতে ফোক্ সং গাইতে।

সাবিত্রী ওই কথাটা শুনে বারান্দায় দাঁড়ালো।

ওঘরে দিদিমণিদের কে ওই মূল্যবান তথ্যটা পরিবেশন করছে আর সকলেই হাসছে। যমুনা উপভোগ করছে সেটা।

কে বলে—তা যা বলেছেন। রেডিওতে স্ট্যান্ডার্ড বলে আর কিছু রইল না।

সাবিত্রী শুনেছে কথাটা।

আজ ওকে তারা হিংসে করে, নইলে এমনি মন্তব্য করতো না। আর তার অপরাধ বেঁচে থাকার জন্য এই কাজ্ করতে হয়।

নিজেকে গড়ে তোলার পিছনে দুস্তর সাধনার কোন দাম নেই। আছে তীব্র ব্যঙ্গ আর আঘাত। কাজলবাবুর ওই অবহেলা—না চেনার ভানটাই তাকে মানুষের সম্বন্ধে ধারণা বদলে দিয়েছে সাবিত্রীর মত মেয়ের। তাই তার আর কোনও যোগ্যতা থাকতে পারে না।

হঠাৎ কার গলা শুনে দাঁড়ায়।

—এই যে, কি যেন নাম হ্যাঁ, সাবিত্রী।

কাজল বলে ওকে।

সরলাদিও রয়েছে কাজলবাবুর সঙ্গে। সে উঠে আসছিল, তাকে খাতির করে সঙ্গে আনে আজকাল। সাবিত্রী কাজলবাবুর কথায় ওর দিকে চাইল ওই কথাগুলো শুনে।

কাজলবাবু বলে হালকা স্বরে।

—সেদিন হঠাৎ দমকা রেডিওতে গাইলে শুনলাম।

ওর কথায় দাঁড়ালো সাবিত্রী।

সরলাদি খুশী হয়। বলে—এখানেই গান শিখছে।

কাজল বলে—একটু গাইতে শিখেই ডাঁট হয়ে গেল।

সাবিত্রী দেখছে কাজলবাবুকে। ও সেই বকশিষের পয়সা ফেরৎ দেবার দিন থেকেই তার সঙ্গে কেমন উল্টো ব্যবহার শুরু করেছে। তাতে ফুটে উঠেছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের আভাস। হয়তো কোনো রাগ না হয় ব্যর্থতা থেকেই ওই জ্বালাটা ফুটে উঠেছে।

সাবিত্রী বলে—কোথায় আর শিখলাম বলুন?

কাজলবাবু বলে—শিখছো কতোদিন? এর আগে গান-টান গাইতে নাকি?

সাবিত্রীর মুখের ডগে জবাবটা এসে গেছল। মনে হয় হাটে হাঁড়িই ভেঙে বসবে সে। ওই গুণমুগ্ধ স্তাবক দলের সামনে সাবিত্রী ওই কাজলবাবুর অতীতের সেই দিনগুলোর কথাই প্রকাশ করবে। কাজলবাবুও ওই ঝাঝালো স্বরে কথাটা বলে ওর মুখ-চোখে ফুটে ওঠা কাঠিন্য দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে। সাবিত্রী চুপ করে কি ভাবছে।

মনে হয় এতটা বলা ঠিক হয় নি। ও জানে সাবিত্রীকে। একটা জায়গায় ওর স্বাতন্ত্র্য আছে। তেজ আছে। এত অভাবের মধ্যেও সে তার কাছে আসে নি, কোনো সাহায্য চায় নি।

সাবিত্রী জবাব দিল না। চুপ করে রইল। সে ওর কথাগুলোয় মনে মনে জ্বলে উঠেছে।

কাজলবাবু দয়ার সুরে মন্তব্য করে—এখন থেকেই যেন অহং ভাব না আসে। শিল্পী হতে গেলে সহজ হতে হবে।

সরলাদি যোগান দেয়—ঠিক বলেছেন। ধরুন আপনি? কে বলবে এত বড় শিল্পী। একেবারে সিম্পল মানুষ। তাই বলছিলাম সাবিত্রী, এদের গুণগুলো দেখে শেখো। এত সুযোগ পেয়েছো।

সাবিত্রীর প্রাণ খুলে হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে।

কাজলবাবু দেখছে ওই সাবিত্রীকে।

কঠিন সন্ধানী চাহনি মেলে কাজল ওই মেয়েটির নীরবতার মধ্যে হয়তো অতীত আর বর্তমানকে দেখছে।

কাজল বলে—গান শেখার ইচ্ছেটা দু'দিনেই যেন শেষ না হয়ে যায়। অনেক মেয়েদের তো এমনিই দেখি।

সাবিত্রী জানাতে পারে না তার মনের ওই নীরব জ্বালাটাকে। সে আরও বড় হতে চায়। তার মনের স্তরে স্তরে বেদনার জমাট অন্ধকারে তার নিঃসঙ্গ মন ওই সুরের ছোঁয়ায় সান্ত্বনা পায়। তার নির্জন নিঃসঙ্গ নির্জনতাকে ভুলতে পারে।

সাবিত্রী বলে—থামতে আমি চাই না।

কাজল তীব্র স্বরে হেসে ওঠে।

—তাই নাকি? শুনে সুখী হলাম।

সাবিত্রীর সব কাঠিন্য—যন্ত্রণা যেন ওই বিদ্রূপের তীব্রতায় খান খান হয়ে যায়। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

কাজলও সেটা দেখেছে।

হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে কাকে আসতে দেখে কাজল হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানায়।

—সুলেখা শোন তোমার শিষ্য কি বলে? আরে বাপ্—একদিন রেডিওতে প্রোগ্রাম করে ডাঁট কতো বেড়ে গেছে।

সাবিত্রীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে এই জঘন্য অপমানে।

সুলেখা ওর দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। কাজলবাবু ওই শান্ত অসহায় মেয়েটিকে চরম আঘাত দিয়ে কি আনন্দ পায় জানে না সুলেখা, ও বলে কাজলবাবুকে।

—কি বলছেন আপনি? একজন সবে গাইছে তাকে শিল্পী হয়ে উৎসাহ দেবেন, তা নয় এমনি ভাবে আঘাত দিয়ে কি লাভ আপনার? যাও, সাবিত্রী কাজে যাও।

সাবিত্রী সুলেখাদির কথাগুলোয় কি একটা আশ্বাস পায়।

কাজলবাবু তখনও হাসছে।

সাবিত্রী সরে এল।

সুলেখা বলে চলেছে—এ সব অন্যায়।

কাজলবাবু বলে—তোমাকেও বলি সুলেখা, হঠাৎ ওই মেয়েটাকে গড়ে তোলার জন্য এত চেষ্টা কেন?

সুলেখা হাসল। ও কি জবাব দিল শুনতে পায় নি সাবিত্রী। তবে কাজলবাবু তাকে শুনিয়েই এইসব কথা বলেছে আজ ইচ্ছে করে।

সাবিত্রী সরে এল।

চোখের জল সে ফেলবে না। মনে হয় চারিদিকে তার কঠিন একটা জগৎ, তারই মাঝে তাকে চলতে হবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তাই সে সুরের নিভৃত আলাপে নিজেকে হারিয়ে ফেলে পরম তৃপ্তিকে খুঁজতে চায়।

আজ সুলেখাদির ওই স্কুল ছাড়ার কথায় সাবিত্রী খুবই খুশী হয়েছে। সেও ওই 'ঝি'-এর পরিচয়টাকে এড়াতে চায়। তাছাড়া কাজলবাবুর সান্নিধ্য এড়িয়ে সে আপন মনে সাধনা করতে পারবে। একদিন ওই মানুষটিকে সবচেয়ে বেশী ভালোবেসেছিল তার কুমারী মন, আজ সাবিত্রী কঠিন বাস্তবের সংঘাতে এসে অনেক অভিজ্ঞতালব্ধ মন দিয়ে বিচার করে দেখেছে—সে অপাত্রেই তার ভালোবাসা সমর্পণ করেছিল। তাই ব্যর্থ হয়েছে সে। কোথাও তার জন্য কোনো সান্ত্বনা নেই।

সাবিত্রী সুলেখাদির কথায় বলে।

—তুমি যখন বলছো যাবো না ওখানে। স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিলাম।

—সেই-ই ভালো। বরং সেই সময় ওই সব করো। আর সামনের সপ্তাহে গ্রামোফোন কোম্পানীর একজন ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলে আসবো; যদি ওঁরা পছন্দ করেন একটা ডিস্ক করতে হবে।

সাবিত্রী যেন স্বপ্ন দেখছে। ধাপে ধাপে উঠছে সে।

উজ্জ্বল আলোভরা নীল আকাশের স্বপ্ন জাগে তার মনে। ওর সুরেও সেই তৃপ্তির প্রকাশ ফুটে ওঠে।

—মন মোর মেঘের সঙ্গী!

কাশফুল ফোটা কোন শুভ্র নীলাভ দিগন্তে তার মন উধাও হয় এই সুরের স্পর্শে। এই তার জগৎ—এখানে সে আনন্দ পেয়েছে। তন্ময় হয়ে গাইছে সাবিত্রী।

সুলেখাদির চেষ্টায় তার গান শুনে সেই ট্রেনার ভদ্রলোক খুশী হন। সাবিত্রী তাঁর নাম শুনেছিল এতদিন। গানের জগতে তিনিও খুব নামী লোক। তবু কতো ভদ্র আর বিনয়ী।

তিনিই বলেন সাবিত্রীকে।

—ঠিক আছে। দু-একদিন রিহার্সেল রুমে গিয়ে গানগুলো তুলে এনে প্রাক্‌টিস করতে হবে। অবশ্য সুলেখাদেবী আছেন। অসুবিধা হবে না। তারপর শুনে রেকর্ডিং ডেট ঠিক করা যাবে।

সাবিত্রী সেই গানগুলো তুলছে। শুধু স্বরলিপিকেই নিখুঁতভাবে গলায় তুলে এ গান সে গাইবে না, তার মনের রূপ-রস-বর্ণ দিয়ে এই বাণী আর সুরকে সে প্রাণবন্ত করে তুলতে চায়। এখন তার অনেক অবসর। স্কুলেও যায় না আর।

সুলেখাদি বাড়িতে নেই, ওর মাকে নিয়ে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে। ফিরতে বৈকাল হয়ে যাবে। একাই সাবিত্রী এ বাড়িতে রয়েছে। তাই গান নিয়ে ব্যস্ত সে। এমন সময় চাকরটা এসে জানায় নীচে এক ভদ্রলোক সুলেখা দিদিমণির খোঁজ করতে এসেছেন।

সাবিত্রী জানে সুলেখাদির কাছে অনেক অনুষ্ঠানের জন্য বা সিনেমার প্লেব্যাক না হয় অন্য ব্যাপারে লোকজন আসেন। তাই ওই খবর শুনে হারমোনিয়াম রেখে উঠলো। বলে সে।

—তুমি যাও হরিদা, আমি যাচ্ছি। ভদ্রলোককে চা দিয়েছো?

হরিদা ওখানের পুরোনো চাকর। জানায় সে।

—হ্যাঁ।

বাড়িটা নির্জন। ওপাশে একটু বাগানমত। সাবিত্রীই সেই বাগানে কিছু কিছু গাছপালা লাগিয়েছে। রজনীগন্ধার সবুজ পাতা ছাপিয়ে সাদা ফুলের স্তবকগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে। বাড়িটায় নীরব শান্তির আভাষ ফুটে ওঠে।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো সাবিত্রী। আর ফেরার পথ নেই। একেবারে ওই ভদ্রলোকের সামনে এসে পড়েছে। অস্ফুট কণ্ঠে সাবিত্রী বলে।

—আপনি? সাবিত্রীর মুখেচোখে ভয় আর বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে।

কাজলবাবুকে এখানে দেখবে এই সময় ভাবতে পারে নি সাবিত্রী।

কাজলবাবুও ওকে দেখছে। সাবিত্রীর মুখেচোখে কি কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। সাবিত্রী জানায় স্থির কণ্ঠে।

—সুলেখাদি এখন বাড়িতে নেই, ফিরতে বৈকাল হবে। তখন আসবেন।

কাজল একটা সিগ্রেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠির আগুনটাকে দেখছে পরে সেটাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে এ্যাসট্রেতে রেখে, সিগ্রেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বলে—আমি জানি। তাই এসেছি এখানে।

—আমার সঙ্গে কোন দরকার নেই আপনার।

সাবিত্রী ওকে দেখছে। কাজলবাবু যেন তার মুখোমুখি হয়েছে ইচ্ছে করেই। সাবিত্রীও বুঝেছে তার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা এখানে বিপদ ডেকে আনবে, আর আজ সাবিত্রী অনেক কষ্ট অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এখানে এসে পৌঁচেছে, আরও উপরে উঠবে সে।

যতই উপরে উঠবে প্রতিষ্ঠিত হবে কাজলবাবুর মনে হবে সে হেরে গেছে সব থেকে বেশী। ততই মরীয়া হয়ে উঠবে সে। তাই সাবিত্রী সব জেনেই ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে হার মানবে না। তাই সাবিত্রী জানায়—আমার কাজ আছে। আপনি এখন আসুন।

কাজল ওকে দেখছে।

সেদিনের মেয়েটির সারা দেহে আজ রূপের জোয়ার। সাবিত্রী ভিতরে চলে যাচ্ছে, কাজলবাবুর ডাকে থামল—দাঁড়াও। সুলেখার দয়া-মায়া কুড়িয়ে বেশ আছো দেখছি। হালচল বদলে গেছে, এখন নাম করছো গান গেয়ে।

সাবিত্রী জবাব দেয় কঠিন স্বরে।

—বস্তির সাধারণ হতদরিদ্র মানুষের দয়া কুড়িয়ে আজ যদি বড় শিল্পী হওয়া যায়, সুলেখাদির দয়ায় আমিই বা হবো না কেন? অন্যায় তো করি নি।

কাজলবাবু ওর কথায় চমকে ওঠে। ওকে ওর অতীত নিয়েই কথাটা বলেছে।

সাবিত্রীও দেখছে তাকে। সে ঠিক ওর দুর্বলতম জায়গাতেই আঘাত হেনেছে। তাই আরও জোরের সঙ্গে জানায় সাবিত্রী এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগটা।

—কিন্তু সেই নামী মানুষটা তার পিছনের পরিচয় ভুলে গিয়ে বিষ-ছোবল দিতে পারে সাপের মত, কিন্তু আমি সেটা ভুলি নি। আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনদিনই

শোধ হবে না—এটা জানি আর মানি। আমার মত সুলেখাদিকে ঠকতে হবে না এর জন্য।

কাজলবাবুর মুখখানা টসটসে রাঙা হয়ে ওঠে কি অপমানে।

সাবিত্রী কথাটা শেষ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে—চোট খাওয়া একটা সাপের মত ফণা তুলে বাতাসে হিস্-হিস্ করছে যে কোন মুহূর্তে আবার ছোবল মারবে—তীব্র গরল জ্বালাভরা সেই ছোবল।

কাজল চুপ করে কি ভাবছে।

আগেকার দিনগুলোর কথা তার মনে আসে।

সাবিত্রীর ওই বদলে যাওয়া স্বরূপটা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। দু'জনেই যেন একটা মিথ্যা ভুল বোঝাবুঝি আর অভিমানকে কেন্দ্র করে উদ্যত ফণা সাপের মত ফুঁসছিল।

কাজল জানে না কোথায় তার জ্বালা। অনেক পেয়েও সে মনে মনে চরম অতৃপ্ত। অনেক পেয়েছে কাজল।

আজ তার গানের কদর বেড়েছে। টাকা পয়সারও মুখ দেখেছে কাজল। সাবিত্রীও তা জেনেছে।

কিন্তু অতীতের সেই দিনগুলোর কথা এতদিন ভোলবার চেষ্টা করেছে, তবু পারে নি।

তিলজলার ওদিকের সেই টিনের বাড়ির অতিসাধারণ মানুষগুলোর কথা আজও ভোলেনি কাজল। তাদের মাঝে হতদরিদ্র অবস্থায় বাস করেছিল কাজল—তার সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়েছিল সেই মানুষগুলোর সাহচর্যে। ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে।

হঠাৎ সেদিন ওই গানের স্কুলে সাবিত্রীকে দেখে কাজল চমকে উঠেছিল। ওখানে যেতে হয়েছিল কাজলকে সুলখার কথায়।

কিন্তু গিয়ে সাবিত্রীকে দেখবে ওই অবস্থায় ভাবতে পারে নি। মনে হয়েছিল সাবিত্রীদের অবস্থার কথা। হয়তো অনেক নীচেই নেমেছে তারা বাঁচার তাগিদে।

কিন্তু দেখেছিল সাবিত্রীর মধ্যে আগেকার সেই তেজী ভাবটা ফুরিয়ে যায় নি। আর দেখেছিল তার সহনশীলতা, ধৈর্য। সেই গানের স্কুলের ঝিগিরি করেও সাবিত্রী নিজেকে এই সাধনার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে।

সুলেখার মুখেও শুনেছে কাজল সাবিত্রীর প্রশংসা। খুশী হয়েছে সে মনে মনে।

সাবিত্রী দেখছে কাজলবাবুকে। আজ সে ওকে চেনে না। আগেকার সেই পরিচয় সবই অর্থহীন বেদনাময় অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। সাবিত্রী ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাই তার ব্যক্তিত্বকে, সম্মানকে এতটুকু হারায় নি। শান্তকণ্ঠে শুধোয় কাজলবাবু সহজ ভাবে।

—মাসীমা কেমন আছেন? মেসোমশাই? কতদিন দেখি নি তাঁদের?

সাবিত্রী ওকে দেখছে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। সেই উদ্যত ফণা মানুষটার এই কণ্ঠস্বরে সেও একটু বিস্মিত হয়েছে। আগেকার উত্তাপ নেই। সাবিত্রী ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না ওকে। মনে হয় সোজা পথে আক্রমণ করতে এসে প্রতিঘাত পেয়ে কাজল এইবার অন্য পথ ধরেছে।

সাবিত্রী প্রশ্ন করে।

—তাঁদের চেনেন?

হাসল কাজল। ম্লান বিষণ্ণ একটু হাসি, তাতে তীক্ষ্ণ পরিহাসের ঝলক নেই। কাজল জানায়।

—চিনি সাবিত্রী। খুব চিনি। সাবিত্রী বলে একটি মেয়েকেও চিনতাম। হয়তো ভালোও বেসেছিল তাকে সেদিনের একটি হতভাগা বাউণ্ডুলে ছেলে।

সাবিত্রীর মনের মাধুরি আজ হারিয়ে গেছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সাবিত্রী জানায়।

—সেই দিনগুলো হারিয়ে গেছে। সে প্রসঙ্গ নাই বা তুললেন আজ।

—তুলি নি। তবে যখন দেখলাম সেই তেজী-গুণী মেয়েটি মুখ বুজে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য একটা স্কুলে ঝিগিরি করছে, তখন সহ্য করতে পারি নি তাকে। তাই তাকে চরম আঘাত করে তার সুপ্ত প্রতিভাকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলাম, তাকে যন্ত্রণার আগুনে ফেলে পুড়িয়ে দেখতে চেয়েছিলাম সে এখনও খাঁটি সোনা আছে না আজকের নোংরামির খাদে ফুরিয়ে গেছে।

সাবিত্রী ওর কথাগুলো শুনছে স্তব্ধ হয়ে। একটু অবাক হয় সে ওই কথা শুনে।

এসব কথা যেন বিশ্বাস করতে পারে না সে। এ অন্য কোন এক কাজলকে দেখছে যে আজও বেঁচে আছে সেই অফুরান ভালোবাসা নিয়ে। অস্ফুট কণ্ঠে কাজল আর্তনাদ করে উঠে থেমে গেল। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। সব বাঁধন যেন তার খসে পড়বে ওই প্রচণ্ড উত্তাপে। সাবিত্রী চুপ করে কি ভাবছে। কাজল বলে খুশী-ভরা স্বরে।

—দেখলাম সে মরে নি। সেই জ্বালায় অগ্নিদগ্ধা হয়ে সে বেঁচে উঠেছে নতুন করে। তাই বলতে এসেছিলাম আরও এগিয়ে যেতে হবে সাবিত্রী, পথ এইখানেই শেষ নয়।

—কি বলছ তুমি কাজল! অস্ফুট কণ্ঠে যেন আর্তনাদ করছে সাবিত্রী।

বাগানের গাছগাছালির বুকে ঝড় উঠেছে—এলামেলো ঝড়। কাজল উঠে দাঁড়িয়েছে।

সাবিত্রীর মুখচোখে কি ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। এতদিনের ভুল বোঝাবুঝির আজ শেষ হয়েছে। খুশী হয়েছে কাজল। আজ ওই কাজলকেই যেন চিনতে চেয়েছিল, দেখতে চেয়েছিল সাবিত্রী। কাজল তা জানে। তাই এড়িয়ে গেল সে। কাজল বলে।

—চলি সাবিত্রী। পরে দেখা হবে।

ওর জবাবের অপেক্ষা না করেই কাজলবাবু বের হয়ে গেল। স্তব্ধ হতচকিত সাবিত্রী একা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেওয়া ওই আঘাতগুলো ফিরে এসে তারই বুকে বেজেছে। কাজল আজও বদলায় নি। সে হয়তো অলক্ষ্যে থেকে তার এগিয়ে যাবার এই পথগুলো বাধামুক্ত করেছে।

সাবিত্রীর মনে হয় নিজের সম্বন্ধে তার সব ধারণাগুলো বদলে যাচ্ছে। কোথায় একটা পাখী ডাকছে ব্যাকুল সুরে। কতক্ষণ এভাবে বসেছিল জানে না সে। বোধহয় অনেকক্ষণ একাই রয়েছে সে।

তার সব ধারণা আর মনের শূন্যতা কি ব্যাকুল বেদনায় রঙীন হয়ে ওঠে। কার ডাকে চমকে চাইল সাবিত্রী।

সুলেখাদিরা ফিরেছে। ও অবাক হয় সাবিত্রীকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে। শুধোয় সুলেখা।

—এখনও বসে আছো? খাও নি? শরীর খারাপ নয় তো? সাবিত্রীর চমক ভাঙে। নিজের কাছেই লজ্জাবোধ হয়। সেই সদ্য জাগর ভাবনাগুলোকে চেপে রেখে বলে সাবিত্রী।

—শরীরটা ভালো নেই আজ।

সুলেখাদি ওর গালে হাত দিয়ে উত্তাপ দেখতে থাকে।

সাবিত্রী বলে,—না জ্বরটর হয় নি। এমনি।

সুলেখাদি বলে—বড্ড অনিয়ম করো তুমি। আজ আর গান নয়—পুরো রেস্ট নেবে। বুঝলে?

সাবিত্রী ভিতরে চলে গেল।

সাবিত্রী সুলেখাদির সামনে থেকে সরে এসেছে নিভৃতে তাদের এই বাড়িতে। ও একা থাকতে চায় ক'দিন।

এখানে এসে মায়ের চোখে ওই পরিবর্তনটাকে লুকোতে পারে নি। মা শুধোয়—কি রে শরীর খারাপ নাকি? সাবিত্রীর সারা মনে যেন ঝড় বইছে।

—না! সাবিত্রী এড়িয়ে থাকতে চায়।

তবু মায়ের মনের উৎকণ্ঠাটাকে ভোলাতে পারে না। মা তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই হয়তো ভাবে। ভয়ও হয় মায়ের মনে।

সাবিত্রী মা-বাবার মধ্যে ওই কথাগুলোও শুনেছে। ওরা সাবিত্রীকে বিয়ে দেবার নাম করে অন্য কারো ঘাড়ে তার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেরা নিষ্কৃতি পেতে চায়।

আজ সাবিত্রী যেন অনেক জটিল সমস্যার মধ্যেই পড়েছে। আর সেই ভাবনাগুলো বেঁচে থাকার ভাবনার চেয়েও অনেক জটিলতর, এটা তার মনের অণুপরমাণুতে একটা আলোড়ন এনেছে।

কাজলবাবু হঠাৎ আজ তার সামনে কি বিচিত্র রূপে এসে তার মনের সব সুরগুলোকে কি প্রাণসম্পদে ভরিয়ে তুলেছে। এই পাওয়ার স্বাদ তার জানা ছিল না।

—সেই সংগ্রামী সাবিত্রী আজ চমকে উঠেছে।

কাজলবাবু আবার তার জীবনে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে, সেই স্বপ্নদেখা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

সাবিত্রী চুপ করে এঘরের তক্তপোষের ওপর বসে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে।

মা বলে—আজ আর যেতে হবে না বাছা। আর যাবার কি উপায় আছে? দিন কাল কি যে হল? ওই শোন!

অন্ধকারে কোথায় দূরে কাছে, দু'একটা বোমার শব্দ ওঠে। তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে পাইপগানের গুলির শব্দ শোনা যায়।

সুধাময়ী বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। এ বাড়ির মানুষটা—অমৃত এখনও ফেরে নি।

ও বলে—কি যে করে রাত অবধি ওরা।

সাবিত্রী চুপ করে ওই শব্দগুলো শুনছে। বাইরের পথের আলো নিভে গেছে।

দূরে কোথায় খন্ডযুদ্ধ বেধেছে। এ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

এর মধ্যে মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে অন্ন পান সংগ্রহের লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছে।

সাবিত্রী মাকে দেখছে ও এখনও উৎকর্ণ হয়ে থাকে রাতের আঁধারে। ওই বোমাবাজি হানাহানির শব্দে শিউরে ওঠে।

অশোকও অমনি উন্মাদ অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে।

সাবিত্রী তবু এই অতল তমসা আর সব হারানোর দিনেও তার নিজের জগতে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

সুধাময়ী যেন সবকিছু তবু মেনে নেবার চেষ্টা করে। এদের সংসারে একটা দিন যায় বেদনার্ত অন্ধকার পার হয়ে অন্যদিন আসে এরা তবু দিন গোনে—হয়তো কোনো সুখবর আসবে।

বসন্তবাবু কেমন গম্ভীর হয়ে গেছেন। মানুষটা যেন আরও বুড়িয়ে গেছে কিসের ভাবনায়। ওঁর মনের সেই ভয় দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের কথা এদের জানাতে পারেন না।

সকালের ডাকে চিঠিখানা আসে অমৃতের নামে। একটা ইনটারভিউ এর চিঠি। এখানে নাকি চাকরীর আশা আছে।

বসন্তবাবু স্বপ্ন দেখেন, মুক্তির স্বপ্ন। অমৃতের চাকরী হবে—তিনি পটলের ওই চাকরী ছেড়ে দিয়েই আসবেন। অহরহ এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন তিনি।

অমৃত তবু চিঠি পেয়ে আশার আলো দেখে না। তার কাছে আশা স্বপ্ন কিছুই আর নেই।

অমৃতের দিকে চেয়ে থাকেন বসন্তবাবু। কি আশ্বাসের সন্ধান করেছেন তিনি।

ক্লান্ত স্বরে বলেন হারানো সেই মানুষটি।

—একটা কিছু হোক তোর অমৃত, আমি আর পারছি না বাবা।

অমৃত তা জানে।

কিন্তু বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে এতটুকু শান্তি দেবার সাধ্য তার নেই।

এ তারই পরাজয়। কোনরকমে সরে এল ওপাশের অন্ধকার খুপরীটায়। পাশের বাড়ির ভাড়াটেরা তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে। এদোঁ গলির মধ্যে ধোঁয়ারও যাবার পথ নেই, জমে জমে বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে। আলোটা টিম টিম করছে এদের জীবনের অস্তিত্বের মতই।

সুধাময়ী দেখছেন বসন্তবাবুকে। লোকটা শান্ত—প্রায়ই বলে ওই কথা। সেদিনের কঠিন মানুষটা আজ ভেঙ্গে পড়েছে। শুধোয় সে।

—কি গো? শরীর ভালো নেই?

বসন্তবাবু স্ত্রীর ডাকে মুখ বুজে চাইলেন। জানান।

—না। ভালোই আছি। তবে কি জানো? ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অমৃতেরও কিছু হল না, অশোকের কোন খবরই পাই নি। কোথায় রইল জানি না।

মেয়েরও বিয়ে-থা দিতে পারলাম না, আশ্রয়ের ঠিকানাও নেই। তাই ভাবি বড় বউ—এই কি চেয়েছিলাম আমরা?

সাবিত্রী ফিরে গেছে সুলেখার ওখানে। তার কি জরুরী কাজ আছে। বাড়িটা শূন্য। বসন্তবাবু আর সুধাময়ী দু'জনে সেই শূন্যতার মাঝে হারিয়ে গেছে।

অন্ধকার নেমেছে। ওই হতাশার অন্ধকার নেমেছে এ বাড়ির মানুষগুলোর জীবনে। কোথাও কোন আশ্বাস নেই।

বসন্তবাবুর মনে হয় অশোকের প্রদীপ্ত তরুণ মন এই বুকচাপা হতাশাকে সহ্য করতে পারে নি। তাই প্রতিবাদের প্রচন্ড আক্রোশে সে ফেটে পড়েছে।

অমৃত পারে নি তা করতে। সে মুখ বুজে প্রত্যহের কশাঘাতগুলো সয়ে চলেছে। আর সেদিনের বিপ্লবী বসন্ত মজুমদার আজও আপোস করে ধুঁকছে বাঁচার বিড়ম্বনা সহ্য করে।

ওপাশের লতিকার ঘরে রেডিওটা খোলা রয়েছে। কি একটা অনুষ্ঠান হচ্চিল। কে বক্ বক্ করছে এক নাগাড়ে।

হঠাৎ সেই বকুনিটা থেমে গেছে।

চমকে ওঠেন বসন্তবাবু, বিচিত্র একটা সুর উঠছে রেডিওতে। মিষ্টি প্রাণময় আর সুরেলা সেই কণ্ঠস্বর।

সাবিত্রীর গান হচ্ছে রেডিওতে।

অমৃতের মনে হয় সবই এমনি অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। কোথাও কোনো আলোর আশ্বাস নেই। তবু বাঁচার জন্য চেষ্টা করে মানুষ। অমৃতও তাই ঘুরছে। রাত্রির কথা ভুলে গেছে। এবার কার্ড রিনিউ করতে গিয়ে ও লাইনের দিকে চেয়ে কার খোঁজ করেছে। রাত্রির দেখা নেই।

হঠাৎ অমৃত সেইদিনই একটা ইন্টারভিউ-এর চিঠি পেয়েছে। হয়তো কোনো সম্ভবনা আছে এই আশা নিয়েই আবার সেজে-গুজে বের হবার চেষ্টা করে। নিজের প্যান্ট-জামা তেমন নেই। জুতোটাও ছিঁড়ে গেছে। এক বন্ধুর জামা-প্যান্ট পরে ওই জুতোটা পালিশ করিয়ে বের হয় আজ।

সুধাময়ী যাবার আগে কপালে দই-এর ফোঁটাও দিয়ে দেয়।

ক'দিন ধরে বাড়িতে একটা গুমোট ভাব রয়েছে। অশোক সেই ভোররাত্রে চলে গেছে তারপর আর কোনো খবর নেই।

লতিকাও নিতুর মা বলে ওরা নাকি এখন ফেরারী আসামী। পুলিশ খুঁজছে ওদের।

চুপ করেই ওসব কথা শুনেছে সুধাময়ী। ওর মন-মেজাজ বিষিয়ে গেছে। এতদিন ধরে মেয়ের সম্বন্ধেই বিচিত্র বিশ্রী আলোচনা আর মন্তব্যগুলো কানে এসেছে, এবার তার সঙ্গে অন্য মন্তব্যও যুক্ত হয়েছে।

সুধাময়ী বলে।

—চাকরী-বাকরী হোক ঠাকুরের দয়ায়, এখান থেকে চল বাবা অন্য কোথাও। সেটা কোথায় রইল কে জানে?

অমৃত মাকে প্রণাম করে বের হ'ল কোন চাকরীওয়ালা বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনা জামা প্যান্ট পরে।

অমৃতের মনে হয় এই সব বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হবে সে। এই প্রহসন তার ভালো লাগে না। তবু বের হয়েছে।

ইন্টারভিউ এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে। আজও তাই এ প্রসঙ্গ তার কাছে নতুন নয়। সেই একই ধরণের আজগুবি প্রশ্ন করেন কর্তারা। ভবিষ্যৎ কেরানীদের

কাছ থেকে গবেষকের প্রতিভা খুঁজতে সময় নষ্ট করেন। অমৃত তবু কিছু জবাব দিয়ে এসেছে এতকাল। আজও দিয়েছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামছে। অমৃত ওখান থেকে বের হয়ে চৌরঙ্গী পাড়ায় একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে। এটা আজ তার কাছে বিলাস বলেই বোধ হয়। নগদ চার আনা পয়সা দিয়ে চায়ের প্রতিটি চুমুক তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। ওপাশের নীল ডিসটেমপার করা দেওয়ালের গায়ের টেবিলে কার হাসির শব্দ শুনে চমকে ওঠে। উছল হাসির শব্দ ওঠে ওখানে।

ওই হাসি তার চেনা।

ওপাশে রাত্রিকে দেখে চাইল। ওর সঙ্গে একটি তরুণ—পরণে দামী টেরিলিনের স্যুট। ডানহাতে খাঁটি সোনার একটা চেন আটকানো। রাত্রির কথায় কি যেন মাদকতার সুর মেশানো, ছেলেটির গাল ধরে একটু নাড়া দিয়ে আদর করে রাত্রি

—ইউ নটি বয়। নো টি নাও?

--দেন? রাত্রি কি বলতে চায় ওকে।

ছেলেটিই কি যেন বলছে তাকে।

---প্লিজ। রাত্রি।

রাত্রিই শোনায় তাকে।

—মাই গড! ইউ আর রিয়েলি ডেনজারাস! দেন—লেট আস্ গো।

ছেলেটির হাতটা ওর নগ্ন মাংসল কোমরটাকে জড়িয়ে ধরেছে। সিল্কের দামী শাড়িটার আঁচল খসে পড়েছে ওর গা থেকে, রাত্রির নিটোল দেহের রেখাগুলো ফুটে উঠেছে, সেই নগ্ন প্রকাশেও কোন দ্বিধা নেই, হিসাবও নেই তার। আশপাশেও নজর নেই রাত্রির।

অমৃত ওইদিকে চেয়ে দেখছে। রাত্রি আর ছেলেটি এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে সামনের বারে ঢুকলো, চায়ের তৃষ্ণার চেয়ে তাদের মনের তৃষ্ণা অনেক বেশী—আরও উছল। রাত্রিও উছল হয়ে উঠেছে।

অমৃত বের হয়ে রাস্তায় নামল। সামনের বারের পালিশ করা গ্লেইজড্ কাচের দরজাটার ওপাশে কি যেন সুর উঠছে। ওখানে কামনার নীল তুফানে কারা ভেসে চলেছে। ওই জীবনের স্রোতে রাত্রিও বদলে গেছে।

ক'মাসের মধ্যে রাত্রির এমনি পরিবর্তন দেখবে আশা করে নি অমৃত।

এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে আজ চমকে উঠেছে অমৃত।

বারের সামনে দু'একটা গাড়ি এসে থামছে, গাড়ি থেকে স্বল্পবাসা নারী-পুরষের দল কলরব করে ওখানে ঢুকছে। সন্ধ্যার আলো জ্বলে ওঠে—ময়দানের দিকে হকারদের পশরার সামনে ভিড় জমেছে। ওদের বিক্রিবাটার কামাই নেই। চৌরঙ্গী এলাকা রঙ্গীন পোষাক পরা মেয়ে-পুরুষের ভিড়ে ভরে থাকে এখন। ওই হাসির আড়ালে ফুটে রয়েছে বিবর্ণ কান্না। তাকে ঢাকার জন্যই এই বর্ণ-বৈচিত্র্য। হকারদের ওখানে মোমবাতিগুলো সারবন্দী দেওয়ালীর আলোক-সজ্জার মত জ্বলছে।

'বার' থেকে দু'একজন বের হচ্ছে। তাদের সোজা হয়ে চলার অবস্থা নেই। কোনরকমে গিয়ে গাড়িতে, ট্যাক্সিতে উঠে চলে যায় তারা। এই মানুষগুলোর বিকৃত কামনার জগতে আজ রাত্রিও সামিল হয়ে গেছে। অমৃত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এক ফাঁকে বারের দরজা খুলে কে ঢুকছে। একঝলক বদ্ধ হাওয়ার সঙ্গে ওখান থেকে ভেসে আসে দ্রুততালে 'জাজ'-এর শব্দ—কাদের উল্লসিত মদ্যপ কণ্ঠের হল্লার শব্দ মিশেছে তাতে।

অমৃত সরে এল। ওই কামনার ফেনিল আবর্তভরা পরিবেশ তার জীবনে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার পাথেয় জোগাড় করতে যাদের দিন কেটে যায় তাদের জীবনে ওটা স্বপ্ন—বিকৃত স্বপ্নই। কিন্তু ভাবতে পারে না রাত্রি ওইখানে নেমে যাবে।

বাড়িটাকে ঘিরে ধোয়া আর আঁধার জমেছে। সুধাময়ী যেন ওর পথ চেয়ে ছিল। অমৃতকে ফিরতে দেখে শুধোয়।

—কি হল রে? ইনটারভিউ কেমন হল?

অমৃতের মনটা ভালো নেই। দেখেছে রাত্রির সেই অবস্থা। মায়ের কথায় জানায়—হ'ল ভালোই।

—কিছু বললে তারা? সুধাময়ীর কণ্ঠে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

বসন্তবাবুও বাড়ি ফিরেছেন। তিনি বসেছিলেন ওদিকের দাওয়ায়। তাঁর মনে হয় কোন আশার কথাই শুনবেন তিনি, যদি অমৃতের কিছু একটা গতি হয় তিনি ওই চক্র থেকে মুক্তি পাবেন।

পটলের ব্যাপার তাঁর ভালো ঠেকছে না, দিন দিন কেমন জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। মুক্তির জন্য ছটফট করছেন।

তাই তিনিও আশাভরে চেয়ে থাকেন ছেলের দিকে। প্রশ্ন করেন।

—কবে ওদের রেজাল্ট বের হবে?

অমৃত ওসব কিছু জানে না। তাই জবাব দেয়—বোধহয় দিন দশেকের মধ্যেই একটা কিছু জানা যাবে।

দরদভরা একটি কণ্ঠস্বর কি সুরের আমেজ ভরিয়ে তুলেছে এঁদো বাড়িটা—বসন্তবাবু উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। সুধাময়ী রান্নার চালা থেকে বের হয়ে এসেছে। সাবিত্রীর ওই সুরে এখানের কোনো আবিলতা মেশে নি—দীপশিখার মত সতেজ শুচিস্নাত প্রদীপ্ত একটি আভার দ্যুতি জেগে ওঠে।

এ বাড়ির অন্ধকারে ওই সুরটা বয়ে আনে একটি আশ্বাস, অমৃতও বের হয়ে এসেছে। সুধাময়ী অবাক হয় সাবিত্রীর গলা শুনে।

—নাই নাই ভয়

হবে, হবে জয়

খুলে যাবে এই দ্বার।

বসন্তবাবু উঠে এসেছেন বারান্দায়। অমৃত অন্ধকারে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে রাত্রির কথাই ভাবছিল হঠাৎ ওই সুরটা তার মনে পড়তে কি আলোর আভাস আনে। ওরা যেন হারায় নি। বসন্তবাবুর চারিদিকে নাগপাশের মত একটা অদৃশ্য বাঁধন দৃঢ়তার হয়ে আসছে। হাঁপিয়ে উঠছেন তিনি। সাবিত্রীর ওই গান সেই অসহায় অবস্থাকে কাটিয়ে তোলবার সাহস আনে। এ বাড়ির অন্ধকারের জীবগুলোর কাছে সাবিত্রী যেন বাঁচার আশ্বাস এনেছে।

তখনও সুরের রেশ রয়ে গেছে।

আশাভরা সুরে বসন্তবাবু বলেন—সাবিত্রীর চেষ্টা বৃথা যাবে না অমুর মা, ওকে বাধা দিও না।

সুধাময়ী ওর দিকে চাইল। সাবিত্রীকে আজ সে অবিশ্বাস করে না। মনে হয় এত ঝড়ের মধ্যেও ওই মেয়েটি সাবধানে একটি প্রদীপ শিখাকে আঁচল আড়াল দিয়ে বন্ধুর পথ বয়ে চলেছে। সাবিত্রী ওই মালিন্যের অনেক ঊর্ধ্বে।

এ সংগ্রামের শেষ নেই।

অশোককে চেনা যায় না। গালে দাড়িগুলো বেড়ে উঠেছে। মাথার চুলও কাটা হয় নি। মুখে একটা শীর্ণতা ফুটে উঠেছে।

একা অশোক নয়, ওরা অনেকেই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই মতবাদের লড়াই ক্রমশ মত্ততার লড়াই-এ পরিণত হয়েছে। এখানে কোন আপোস নেই। বস্তির এই দিকটায় অন্ধকার জমে আছে।

ওরা তাড়া খেয়ে দূর অঞ্চলের এই গোপন আস্তানায় এসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

ওই সব অঞ্চলে তাদের ফেরার পথ নেই। সেখানে ওৎ পেতে আছে তাদেরই ভূর্তপূর্ব বন্ধু-সহপাঠির দল।

একসঙ্গে খেলেছে, পড়েছে একদিন অতীতে, আজ কি এক হিংস্রতায় তারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে ফিরছে। দেখা হলেই হানাহানি বেধে যাবে।

দূরে কোথায় রাতের অন্ধকারে বোমার শব্দ ওঠে। কাঁপছে মুলি বাঁশের ঘরটা।

পরেশ রাগে গর্জাচ্ছে।

—একদিন এইবার লড়ে যাবো, ওদের ঠান্ডা করে দিতে হবে।

কেন তা জানে না।

খাওয়া জোটে নি আজ। গুপীনাথ ফিরে এসেছে শূন্য হাতে।

বলে সে।

—গোর্বদ্ধন আর দেবে না কিছু, ও এখন মত বদলেছে। বলে তোমাদের পথে আর নেই।

পরেশ গর্জে ওঠে।

—আজ চৈতন্য হয়েছে ব্যাটার, তখন তো খুব মদত দিয়েছিল। এখন ভানুর দলকে মদত দিচ্ছে।

ছেলেগুলো অন্ধকারে বিবর্ণ মুখে বসে আছে। ওদের আজ বন্য আদিম শ্রেণীতে ঠেলে দিয়েছে ওই গোর্বদ্ধনের মত স্বার্থবাদীদের দল। ফেরার পথও রাখে নি।

মরীয়া হয়ে উঠেছে তারা। কে বলে।

—গোবরা বাঁচবে এই করে? আমাদের শেষ করে ও বাঁচবে?

অশোকের চোখ জ্বলছে অন্ধকারে।

ওরা থামবে না। বলে সে।

—খর্চার খাতায় লেখা মানুষ আমরা, মরতে হয় কিছু কাজ করেই মরবো। অন্ধকারে ওদের ও সব পথ—আশ্বাস কোন গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে।

বাবার কথা মনে পড়ে, বাবা বলতেন।

—ওদের সব আশ্বাস যেদিন মিথ্যা হয়ে যাবে সেদিনও এই মত-বাদকে ধরে থাকতে পারবি অশোক?

আজ তাদের সেই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

খিদেও লেগেছে। এর তীব্রতা ক্রমশ বিনিদ্র রাতে বেড়ে ওঠে মনের তীব্র জ্বালার সঙ্গে।

গোর্বদ্ধন মিত্তির জানে কখন কোন্‌দিকে মদত দিতে হয়। তাই এতকাল ওই ছেলের দলকে মদত দিয়েছিল তার রাজনৈতিক নেতা সেজে থাকার জন্য।

ক্রমশ দেখেছে এবার নিজেকে টিকিয়ে রাখতে গেলে অন্য পথ ধরতে হবে। ওই অশোকের দল সেদিনের লড়াই-এ জিততে পারে নি। ওরা চোট খেয়ে পালিয়ে গেছে এখান থেকে।

আর রাতারাতি গোর্বদ্ধনবাবুও মত বদলে নিয়েছে। এখন নতুন দলেরই সমর্থক, তাদেরই যোগান দিয়ে চলেছে।

জানতো হয়তো মরীয়া হয়ে ওরা হামলা করবে। তাই আটঘাট বেঁধেই রেখেছে। অশোককেই তার ভয় বেশী। ছেলেটা মরীয়া, আর যতো আঘাত পেয়ে কোণঠাসা হবে ততই মরীয়া হয়ে উঠবে তারা।

পুলিশও খুঁজছে তাদের।

রাতের অন্ধকারে তাই মরীয়া হয়ে হামলা করেছে আজ অশোকের দলবল। রাস্তার আলোগুলো নেভানো। গোর্বদ্ধনবাবুর বাড়ির জানলা কপাটও বন্ধ। রাস্তার ওদিকে গোর্বদ্ধনবাবুর নতুন সমর্থক দলের ছেলেরা রকে বসেছিল, হঠাৎ অন্ধকারে ওদিক থেকে কয়েকটা বোমা আগুনের ঝলক নিয়ে গর্জে ওঠে, স্পিন্টারগুলো ছিটকে পড়ে চারিদিকে, এদের একটা ছেলে ছিটকে পড়েছে, অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

এরাও লাফ দিয়ে উঠেছে। ওই আহত ছেলেটার দিকে চাইবার সময় নেই। ওপাশের থলিতে বোমা ছিল, ওটা সঙ্গেই থাকে।

এরাও জবাব দিতে থাকে।

দেওয়ালের ও কোণে দাঁড়িয়ে আছে পজিশন নিয়ে অশোক, ওরা আজ এপাড়া দখলের জন্য মরীয়া হয়ে হানা দিয়েছে।

বোমা গুলীর শব্দ শোনা যায়।

এই ছেলেরাও রুখবার চেষ্টা করে।

গোর্বদ্ধনবাবু অবশ্য পুলিশে খবর দিয়েছেন। অন্ধকারে হেডলাইট জ্বেলে গাড়িগুলো আসছে। অশোকের দল আজও পারে নি—ওরা পালালো কোনরকমে।

পাড়ায় লোকজন আতঙ্কে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সব শান্তি কোথায় হারিয়ে গেছে।

অশোকদের টিনের বাড়ির মানুষগুলোও ভয়ে শুকিয়ে গেছে। অন্ধকারে তখনও কারা ছুটোছুটি করছে। কে বলে।

—বাইরে থেকে কারা এ পাড়া এ্যাটাক্ করতে এসেছিল। খুব ঠেকিয়েছে এরা। দু'একজন জখম হয়েছে।

গোর্বদ্ধনবাবু আর পাড়ার কিছু লোকও বের হয়েছে পুলিশ দেখে।

গোর্বদ্ধনবাবু নিপাট নিরীহ ভালোমানুষের মত জানায়—দেখুন, কি অত্যাচার দেখুন।

ছেলের দল গর্জাচ্ছে।

'আবছা অন্ধকারে সেই লড়াই-এর মধ্যেও তারা আক্রমণকারীদের দু'চারজনকে চিনে রেখেছে।

তারা শাসায়।

—ওদের চিনি, এখনও এখানে হেল্প পাচ্ছে তারা। দরকার হলে সবাইকে ঠান্ডা করে দোব।

গোর্বদ্ধনবাবু ওদের থামাবার চেষ্টা করেন।

—এ নিত্যকার ঘটনা। এ অঞ্চলের মানুষের যেন সয়ে গেছে। বোমাবাজি গুলী-হানাহানির সময়টা এরা চুপচাপ ঘরের কোণে থাকে।

আবার ও পর্ব শেষ হলে সাধারণ মানুষও বের হয় দৈনন্দিন কাজে। যেন কোথাও কিছু হয় নি।

তবু সাবধানে থাকে—যখন তখন একটা গোলমাল বেধে যেতে পারে।

এই অনিশ্চিত জীবনে মানুষগুলো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ছেলের দল তবু মোড়ে মোড়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে। কাজকর্ম তাদের নেই—চাকরীর আশাও দুরাশা।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রার স্রোতে তাই মাঝে মাঝে আবর্ত ওঠে, আবার থিতিয়ে পড়ে।

অমৃত সকালবেলাতেই বাজার সেরে কি ভেবে রেলব্রিজ পার হয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে এগিয়ে যায়। রাত্রির সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি, সেই সন্ধ্যায় গেছল তারপর আর যাবার সুযোগ হয় নি। পথে ট্রামে দু'একদিন দেখা হয়েছে। রাত্রি তখনও চাকরীর আশায় ঘুরছে।

তারপর দেখেছে কাল সন্ধ্যায় তাকে চৌরঙ্গীতে। অমৃতের মনের অতলে একটা সুপ্ত আশ্বাস কোথায় ছিল—হঠাৎ সেই স্বপ্নের অপমৃত্যুটাকে আরও গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে তার মন কি বেদনায় ভরে উঠেছে। তবু মনে হয় যেটা দেখেছে সেটা রাত্রির জীবনে সত্য নয়। তাই চলেছে সে।

সকালে এদিকে লোকচলাচল কম। দু'চারজন অফিসযাত্রী বের হয়েছে। অমৃত ওই ভাগ্যবানদের দিকে চেয়ে থাকে। ওদের তবু বাঁচার একটা উপায় আছে আর সময়টাকেও এত যন্ত্রণাদায়ক বলে বোধ হয় না। তার কাছে সময়ের বোঝাটাই মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে ওঠে। মনে হয় সে নিদারুণভাবে হেরে গেছে।

দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে গিয়ে দরজায় আর সেই কলিংবেলের চিহ্ন ও খুঁজে পায় না। বিবর্ণ নেমপ্লেটটার স্ক্রুগুলো আলগা হয়ে গেছে, ওটা ফালতু কাঠের টুকরোর মত ঝুলছে। যে কোন সময় পড়ে যাবে, খসে যাবে।

অমৃত দাঁড়ালো, মনে হয় এখানে আসার কোন যুক্তি নেই।

এভাবে রাত্রির সামনে আসতে সে চায় নি, কিন্তু কেন জানে না সে নিজেকে

আটকাতে পারে নি, একটা দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে এই আসায়। নেমপ্লেটটা ঝুলছে। ওটা যেন অসিতবাবুর জীবনের মতই। কোন রকমে টিকে আছে মাত্র খসে যাওয়ার অপেক্ষায়। হয়তো অমৃতের বেলাতেও ওটা সত্যি।

—হু দেয়ার?

কড়া বেশ কিছুক্ষণ নাড়ার পর দরজাটা খুলে গেল। সামনেই অমৃত দেখছে অসিতবাবুকে। ঘুম বোধহয় ওঁর নেই—ক'মাসেই রংটা আরও কালো বিবর্ণ হয়ে গাল দুটো তুবড়ে গেছে। চোখের তারার রং হলদে গোছের, ওই পোড়া চুরুট মুখে ঠিক ধরা আছে। আর শীর্ণ লম্বা শরীর ঢেকে ড্রেসিং গাউন রয়েছে, তার একটা হাত ছিঁড়ে ঝুলছে পাশে নববড় করে।

অমৃতকে দেখছেন তিনি দরজাটা বন্ধ করে। ফ্যাসফেঁসে গলায় শুধোন।

—একদিন এসেছিলেন না? রাত্রির বয় ফ্রেন্ড তুমি। এনাদার ওয়ান? এ্যাঁ;

অমৃত জবাব দেয়—এমনি চেনা-জানা, এদিকে যাচ্ছিলাম তাই।

—চেনা-জানা; বিড়বিড় করছেন অসিতবাবু। হঠাৎ অমৃতকে কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন ,সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।

—হলপ পাঠ করেছো? ষ্ট্যান্ড ইন এটেনশন। এজলাসে কথা বলার আগে হলপ পাঠ করতে হয় জানো না?

অমৃত থমকে দাঁড়ালো। অসিতবাবুর দু'চোখ ঝকঝক করে ওঠে। শীর্ণ মানুষটার গলার শির ফুলে উঠেছে। হাত তুলে তিনি বেশ জোর গলায় বলে চলেছেন।

—ইন দি নেম অব্ এমপারার অব্ ইন্ডিয়া—আই একিউজ দি—অব্ হঠাৎ ভদ্রলোক থেমে গেলেন কার চীৎকারে!

—ড্যাডি! আবার শুরু করেছো? লাইফ হেল করে ছাড়বে। উঃ!

অসিতবাবুর চীৎকারে ওপাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসছে রাত্রি। শাড়িটা কোনরকমে জড়ানো রয়েছে। মাথার এক-রাশ বব্ করা চুল কেশরের মত উস্কো-খুস্কোভাবে ফুলে উঠেছে। চোখে-মুখে ক্লান্তির গাঢ় ছায়া; চোখের পাতাগুলো ভারী ভারী হয়ে রয়েছে। ওর ওই বে-আব্রু দেহটার দিকে চেয়ে চোখ নামালো অমৃত। হকচকিয়ে রাত্রিও দেখছে তাকে।

রাত্রির ধমক খেয়ে অসিতবাবু থেমে গেছেন। এতক্ষণ লোকটা যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল। এখন সেই জ্বলে ওঠা ভাবটা মিইয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে ফণা নামানো সাপের মত নিস্তেজভাবে অসিতবাবু ওঘরের দিকে চলে গেলেন। রাত্রি বলে ক্লান্ত স্বরে।

—মাঝে মাঝে পাগলের মত আজে-বাজে বকেন। 'মেমারি'ও ফেল করেছে। আমাকে বলেন—গুলী করে মেরে ফেলবো। কি যে যন্ত্রণায় পড়েছি অমৃত।

ক্লান্ত কণ্ঠে রাত্রি শুনিয়ে চলে—অবশ্য আই এম্ হেল্পলেস অমৃত। অনেক চেষ্টা করেছি বেঁচে থাকার জন্য, দোরে দোরে ঘুরেছি। কিন্তু কিছুই হয় নি। একদিন দেখলাম ওই নীতি বিবেক সব মিথ্যা। ওগুলো নিয়ে বাঁচা যায় না এই যুগে। তাই বাধ্য হয়েই সবকিছুকে কানাকড়ির দামে বিকিয়ে দিলাম। আই এ্যাম লষ্ট।

রাত্রি নিজেকে সামলে নিয়েই বলে।

—দাঁড়িয়ে রইলে যে! বসবে না? চল—

অমৃত কি ভেবে বসল। কালকের বৈকালে—সন্ধ্যায় দেখা সেই কৃত্রিম রং বাহারে ঝলমল মাদকতা আনা সেই মেয়েটি এ নয়। রাত্রির চোখে-মুখে অসহায় ক্লান্তির আভাস।

অমৃত কালকের বৈকালের কথাটা বলে না। শুধোলো সাধারণ সহজ স্বরে।

—চাকরী-বাকরী কি করছো?

রাত্রি ওর দিকে চাইল। ওর কালো চোখের অতল চাহনিতে ফুটে ওঠে নীরব আর্তি। সেটাকে চাপবার চেষ্টা করে সে জানায়।

—একটা কাজ আপাতত করছি। জানি না কতোদিন করতে হবে। এক এক সময় মনে হয় অমৃত আমরা সবাই পাগল হয়ে যাবো। ড্যাডির মত বর্তমানকে ভুলে অতীতের মধ্যেই কিসের সন্ধান করবো। কারণ বর্তমান আমাদের কাছে দুঃসহ বেদনার, আর ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে যন্ত্রণাময়—আতঙ্কের মুহূর্ত। বাবাকে দেখলে? উনি সেই সাম্রাজ্যের যুগেই বাস করছেন, আমাদের সেই অতীতের গৌরবও নেই। তাই অন্ধকারেই ডুবে যাবো। তাই হয়তো যেতে বসেছি অমৃত।

অমৃত কথা বললো না। রাত্রির দিকে চেয়ে থাকে।

তার বাবার কথাও মনে পড়ে, অমৃত নিজেদের সংসারেও দেখেছে এই একই সত্যের পুনরাবৃত্তি। সেখানে সান্ত্বনা নেই। অশোক হারিয়ে গেছে। তার নিজের জীবনেও দেখেছে এই অতল তমসা, নিজেই যে সান্ত্বনা পায় নি সে অপরকে কি আশ্বাস দেবে। বসন্তবাবু আজ ধুঁকছেন।

অমৃত চুপ করে কি ভাবছে। রাত্রি অমৃতকে জানায় সহজ হবার চেষ্টা করে।

—চা আনি।

—আবার চায়ের হাঙ্গামা করবে? অমৃত বাধা দেবার চেষ্টা করে।

রাত্রি জানায়—হিটারে জল চাপিয়ে এসেছি। এক মিনিট।... রাত্রি ওদিকে চলে গেল। একা রয়েছে অমৃত।

—ডু ইউ কনজিউম্ এ্যালকোহল? এনি স্পিরিটি? কাম অন্, অ্যানসার মাই কোশ্চেন?

অমৃত ওই কথা শুনে চাইল।

অসিতবাবু সুযোগ পেয়ে আবার ফিরে এসেছেন।

অমৃত ওর কথার জবাবে জানায়।

—ওসব খাই না। বেকার—চাকরী-বাকরী নেই ওসব জুটবে কোত্থেকে?

হাসছেন অসিতবাবু—রাইট। বেকার রয়েছো এখনও? অবশ্য এখনকার দিনে এটাই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন।

অমৃত চুপ করে থাকে।

অসিতবাবু জানান ওকে বেদনার্ত স্বরে—বুঝলে, রাত্রি বেকার ছিল, ও নাকি চাকরী পেয়েছে। আমার মেয়েকেও ইচ্ছে করলে ভালো ঘরে দিতে পারতাম, বাট্ আই এম নাও পেনিলেশ। একমাত্র মেয়ে রাত্রিকেও চাকরী করতে হয়—আমি তাই দেখছি। শেম্। শেম্ ফর মি!

অসিতবাবুর চোখের সামনে রাত্রির সেই গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরার দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। অসহায় মানুষটার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে একটা দুঃসহ যন্ত্রণা। বলেন তিনি।

—ওই অপমান ওকে সহ্য করতে হচ্ছে। ওসব দেখে এখনও তবু বেঁচে আছি। তুমি তো ওর বন্ধু? অসিতবাবু কি বলতে চান অমৃতকে।

অমৃত রাত্রিকে ভালোবাসে না শুধু বন্ধুত্বই তাদের সম্পর্ক তা ঠিক ভাবে নি। ওই প্রশ্নে বিব্রত বোধ করে অমৃত। অসিতবাবু বলেন কাতরকণ্ঠে ওর কাছে এসে।

—ওর জন্য কিছু করতে পারো না? কোন আশ্বাস কি নেই রাত্রির? হঠাৎ অসিতবাবু বদলে যান। ওর মুখে-চোখে ফুটে ওঠে কি কাঠিন্য। আপন মনেই বিড়বিড় করতে থাকেন।

This way the world ends

Not with a bang

But with a whimper

অসিতবাবু আর্তকণ্ঠে বলেন।

—বুঝলে? প্রচন্ড বিস্ফোরণে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে নয়—এমনি ঘেংড়ে ঘেংড়ে চাপা কান্নার অতলে সৃষ্টি একদিন রসাতলে যাবে—সেদিনেরও দেরী নেই।

ভদ্রলোক আবার ফিরে গেছেন। তখনও ওর সেই অসহায় মর্মের নিস্ফল আকুতিটা এখানের বাতাসে মিশিয়ে আছে। অমৃতের সারা মনকে অভিভূত করে ওই কথাগুলো।

রাত্রি ঢুকছে চায়ের পেয়ালা নিয়ে। ততক্ষণে শাড়িটা গোছগাছ করে নিয়েছে। মুখে-চোখে জল দিয়ে এসেছে। ওর মুখে তখনও জলের সজীবতা মুখখানাকে লাবণ্যময় করে তুলেছে। স্নিগ্ধতর করেছে ওর চাহনিকে।

রাত্রির এই যেন আসল রূপ। ওই মেয়েটির মনের অতলের দুঃসহ যন্ত্রণার প্রকাশকে দেখছে অমৃত। রাত্রি ওকে চেয়ে থাকতে দেখে শুধোয়।

—কি হল? কি দেখছো?

এ যেন অন্য ছবি। অমৃত পেয়ালার চুমুক দিতে দিতে জানায় —কিছু না।

বেলা হয়ে গেছে। নীচের রাস্তায় তখন অফিসযাত্রীর দল চলছে। অমৃতের খেয়াল হয় রাত্রি যেন চাকরী পেয়েছে।

তাই বলে—তুমি আপিস বেরুবে না?

ইতস্তঃত করে রাত্রি জানায়—বেলায় বের হই, বৈকালের দিকে। একটু বসো না—তাড়া তো নেই তোমার।

অমৃত ওকে দেখছে। আজ রাত্রিকে মনে হয় অনেক সহজ আর কি যেন ভাবছে সে।

অমৃত লক্ষ্য করেছে রাত্রির মুখে-চোখে হঠাৎ যেন একটা কালো ছায়া নেমেছিল অমৃতের প্রশ্নে। কালকের সন্ধ্যার সেই মেয়েটিকে স্মরণ করতে চেষ্টা করে অমৃত।

সেই লাস্যময়ী রূপ ওর সত্যিকার নয়, সেই রূপের প্রকাশে হাসির ধারালো ঝিলিকে ও জীবনকেই ব্যঙ্গ করে নিষ্ঠুরভাবে।

আবার এই দিনের বৃত্তে ফিরে এসে বদলে যায় রাত্রি। তার চিরন্তন হতাশার মাঝে আশার স্বপ্ন দেখে।

রাত্রি শুধোল অমৃতকে।

—তোমার কাজ কর্ম কিছু হল?

অমৃত এবার ইনটারভিউ দিয়েছে ভালোই। তাছাড়া ওই অফিসের একজন কর্তা-ব্যক্তিকে ধরেছে। এবার অমৃতও আশা করছে কিছু।

তাই জানায় অমৃত।

—চেষ্টা করছি। দু'এক জায়গায় কথাও হয়েছে। তবে না হওয়া পর্যন্ত কিছু বিশ্বাস নেই।

রাত্রি ওর দিকে চেয়ে আছে। ওই দৃষ্টিতে একটা শূন্যতার বেদনা। ম্লাণ বিষণ্ণ সেই চাহনি।

রাত্রি বলে।

—তাই কিছু হোক অমৃত।

অর্থাৎ অমৃতের একটা চাকরি হওয়ায় তারও পূর্ণ সমর্থন আছে। হয়তো আরও কিছু জানাতে চায় সে, সেটা তার চোখে ফুটে উঠেছে। মুখ ফুটে বলতে পারে না।

অমৃত বলে—আজ উঠি রাত্রি।

রাত্রি কি ভাবছিল। ওর কথায় চমক ভাঙ্গে তার।

রাত্রি জানায়।

—এদিকে এলে আসবে কিন্তু।

এই আহ্বানে কৃত্রিমতা নেই। অমৃত জানায়।

—থাকবে তো বাড়িতে?

রাত্রি হাসবার চেষ্টা করে। বিষণ্ণকণ্ঠে বলে।

—যদি হারিয়ে না যাই—নিশ্চয়ই থাকবো অমৃত।

রাত্রি যেন অনেক কাছে এসে গেছে তার।

ওর চুলের মিষ্টি গন্ধটা অমৃতের নাকে এসেছে। ওর কোমল সুন্দর দেহটা অনেক ঘনিষ্ঠ, দেহের উত্তাপের ছোঁয়া লেগেছে অমৃতের বঞ্চিত ব্যর্থ মনে। কি সাড়া জাগায়।

অমৃত বের হয়ে এল।

ওর মনে এত শূন্যতার মাঝেও কি পূর্ণতার সুর ওঠে। মনে হয় রাত্রি বদলায় না, অনেক যন্ত্রণার গ্লানিতে সে বিবর্ণ তবু বিকৃত নয়।

অমৃতের মনে একটা আশ্বাস এনেছে আজকের দিনটা।

সাবিত্রী জীবনকে দেখেছে অন্য দৃষ্টিতে। আজ তার সামনে একটা রূপময় জগতের বন্ধ দ্বার খুলে গেছে।

অনেক দুঃখ কষ্টের মাঝে সে হারিয়ে যায় নি। এতদিনের সাধনা স্বপ্ন তার সফল হতে চলেছে।

ক্রমশ গানের কদর বাড়ছে। এখন বাইরে থেকে ডাক আসে।

টাকাও আসছে কিছু কিছু। নাম-ডাকও বাড়ছে ক্রমশ। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে কারণ তার গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কোন ভদ্রলোক এসেছেন গানের ব্যাপারে, সুলেখাদির সামনেই ভদ্রলোক বলেন—সাবিত্রী দেবীকে নিয়েই অনুষ্ঠান করাতে চাই। ওঁকে গাইতে হবে।

সুলেখা একটু অবাক হয়। এ যেন তারই শিল্পীসত্তার অবমাননা। সাবিত্রী বসেছিল ওপাশে, ও দেখেছে সুলেখাদির মুখে ক্ষণিক বিবর্ণতার ছায়াটা। সাবিত্রী বলে ওঠে প্রতিবাদের স্বরে।

– কেন? সুলেখাদিই গাইবেন ওখানে। আমি তো সবে শিখছি।

ভদ্রলোক গানের ব্যবসাটা ভালো বোঝেন। তাই বলেন তিনি একটু স্পষ্ট ভাষায়।

– মানে, ওঁর গান তো প্রাযই শোনে সকলে, আপনি এখন বাইজিং—তাই আপনাকেই নিয়ে যেতে চাই। অবশ্য আপনার যা প্রণামী—তা নিশ্চয়ই দেব। যদি যান।

তার মনের আঘাতটা সামলে নিয়ে সুলেখাদিই বলে—হ্যাঁ যাবে। ভদ্রলোক টাকাকড়ি দিয়ে চলে গেলেন।

সাবিত্রীর ভালো লাগে না ব্যাপারটা। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায়ই ঘটতে থাকে। সুলেখাদির আশ্রয়ে থেকে তার সঙ্গে এমনি ব্যবহার করতে বিশ্রী লাগে তার। তাই সাবিত্রী বলে ওঠে।

—ওসব আমি চাই নি লেখাদি। তোমার সামনে ওরা এইসব কথা বলবে। আমি কি এমন গাইতে পারি যে তোমার মুখেব ওপর ওরা এসব শোনাবে? গান গাইবো না তার চেয়ে সেই-ই ছিল ভালো। ওখানে না গেলেই ভালো হতো।

সুলেখাদির কাছে সাবিত্রী নিজেকে ছোট বোধ করে।

সুলেখা বলে।

—শিল্পীরও যৌবন আছে রে। তাদেব প্রতিভারও যৌবনেই পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এই সময নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। আমাদের গান হযতো ওদেব পুরোনো লাগে, তাই নতুনকেই চায় তারা।

—ছাই। আমার গানের দাম কি বলো?

সাবিত্রী সুলেখাদির দিকে চেয়ে থাকে। তারই দয়ায় এখানে ঠাঁই পেয়েছে সাবিত্রী, সুলেখাদি তাকে গান শিখিয়েছে অনেক ধৈর্য নিয়ে।

গানের স্কুলেব চাকরী ছাড়াতে সুলেখাদিরও মত ছিল।

সাবিত্রীও সময় পেয়েছিল গানের রেওয়াজ করতে। দেখেছিল মাঝে মাঝে সুলেখাদির এখানে কাজলবাবুও আসেন।

সাবিত্রী সাবধানে ওই লোকটিকে এড়িয়ে গেছে। সেই অপমান অবহেলাটা ভোলে নি সাবিত্রী।

কাজলবাবু ওঘর থেকে তার রেওয়াজ শুনেছেন। সুলেখাদি আর কাজলবাবু বের হয়ে গেছেন কোথায অনুষ্ঠান করতে।

সাবিত্রী তখন আশা করতো সেও অমনি গান গাইবে। বাইবে অনুষ্ঠান করতে যাবে।

আজ সেই অবস্থায় এসেছে সাবিত্রী। দেখছে সুলেখাদিকে নয়, আজ তাকেই গাইতে নিয়ে যেতে চায় তারা।

সুলেখাদির সুন্দর মুখে কালো ছায়াটা সাবিত্রীর দৃষ্টি এড়ায় নি। অন্তরের অতলে শিল্পীমন তার এই সাফল্যে খুশী হয়েছে, ততই নিজেকে যেন অপরাধী বোধ করছে সাবিত্রী।

সুলেখাদিকে কথাগুলো বলে ভিতরে চলে এল।

সুলেখাদি কি ভাবছে। সাবিত্রী যে ধাপে ধাপে উঠবে তা ভাবে নি সুলেখা, ভেবেছিল দু'চারদিন গাইবার পর সাবিত্রী নিজেই গান ছেড়ে দেবে।

কিন্তু তারই আশ্রয়ে থেকে এভাবে তার চেয়ে বড় শিল্পী হবে সাবিত্রী একথাটা ভাবতে সুলেখার নারীমনও আজ বেদনা বোধ করে। হয়তো সুলেখা হিংসা করে সাবিত্রীকে। আবও লক্ষ্য করেছে সুলেখা, কাজল এখানে এসে ওঘর থেকে তন্ময় হয়ে সুলেখার গান শোনে। সুলেখা এটা চায় না। কাজলবাবু বলেন।

-- তোমার সাবিত্রী তো বেশ গাইছে আজকাল? সুলেখা নিজের কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করলেও এই প্রশংসাটাকে সহ্য করতে পারে না।

ক্রমশ দুটি নারীর মধ্যে একটা পার্থক্য গড়ে উঠেছে। আজকে ওই অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কথায় সুলেখাও বুঝেছে এটা এইবার প্রকট হয়ে উঠবে। তাই সুলেখা আজ সাবিত্রীকে মুখে সমর্থন করলেও মনে মনে সহ্য করতে পারছে না।

সাবিত্রীর এতদিনের হতাশাভরা মনটা ক্রমশ যেন নিজের ব্যক্তিত্ব আব শিল্পীসত্তা নিয়ে জেগে উঠছে। সেও বুঝেছে তার নিজের যোগ্যতা আরও বেশীমাত্রায় অর্জন করতে হবে।

ওই অনুষ্ঠানে এসে অবাক হয় সাবিত্রী। এতবড় অনুষ্ঠানে তাকে গাইতে হবে ভাবেনি।

বিরাট প্যান্ডেল তৈরী করা হয়েছে আর শিল্পী-সমাবেশও অভূতপূর্ব। ক্রমশ অবাক হয় সাবিত্রী এই শিল্পীদের মধ্যে কাজলবাবুকে দেখে। তিনি ওখানে বেশ প্রতিষ্ঠিত আরও বুঝতে পারে যে তাকে এখানে গাইবার ব্যবস্থা করেছেন কাজলবাবুই। ও কথা

ভেবে অবাক হয় সাবিত্রী। মানুষটা যেন সত্যিই বিচিত্র। বাইরে ভিতরে তার মিল নেই। কাজলবাবুও এসেছেন এখানে।

সাবিত্রী দেখেছে কাজলবাবুর প্রতিপত্তি এ মহলে। তাঁর অনুষ্ঠান শোনার জন্যই এতো জনসমাগম ঘটেছে। কাজলবাবুই বলে সাবিত্রীকে।

—এখানে তোমাকে সবচেয়ে ভালো অনুষ্ঠান করতে হবে সাবিত্রী। করবে তা জানি।

সাবিত্রী ওর দিকে চাইল। কি ভয়ে ওর বুক দুরুদুরু কাঁপছে। সেদিনের সেই এঁদো বাড়ির মেয়েটি যেন আগেকার কাজলকে দেখছে। তার মনের বিচিত্র একটা সুর ওঠে।

ভয়ে ভয়ে সাবিত্রী বলে।

—আমি কি পারবো?

—পারতেই হবে! ওকে আশ্বাস দেন কাজলবাবু। সে ওকে আজ এই সুযোগটা দিয়েছে। বলেন।

—জানি পারবে তুমি। তাই এদের কাছে তোমার নাম আমিই করেছিলাম। একটু অবাক হয় সাবিত্রী। ও এতদিনের মেলামেশায় জেনেছে সুলেখাদির মনের অতলে কাজলবাবুর জন্য একটা ঠাঁই রয়ে গেছে—আর সেই নিভৃত পরিচয়ের খবর সাবিত্রী জানে। কাজলবাবুও ঘনিষ্ঠভাবেই মেশেন সুলেখাদির সঙ্গে। দু'জনে অনেক জায়গাতেই অনুষ্ঠান করতে গেছেন।

কিন্তু আজ সাবিত্রী কাজলবাবুর মুখে ওই কথা শুনে অবাক হয়েছে। কাজলবাবু তার জন্য বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বলেন কাজলবাবু।

—এই তোমার নামখ্যাতি পাবার সময়। এখন তাই এসব অনুষ্ঠানে আসা দরকার। ভালো করে গাওয়া চাই-ই।

সাবিত্রী জানে না তার এই অন্য সত্তাকে। গাইতে বসে সে সব ভুলে যায়। সামনে আবছা অন্ধকারে ওই জনতার কালো ছায়াগুলো একাকার হয়ে গেছে। ওদের অস্তিত্বের খবর ভুলে গেছে সে। প্রাণভরে তাই গাইছে সাবিত্রী। মনে হয় তার সুরের যাদুতে ওই হাজারো মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে গেছে।

ওদের হাততালির শব্দে সাবিত্রীর চমক ভাঙে। এতক্ষণ যেন গানের জগতে হারিয়ে গেছল সে।

আজকের আসরে তার অনুষ্ঠান সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে। শ্রোতারাও স্বীকার করে।

সাবিত্রী ওই জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে নেমে এল মঞ্চ থেকে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাজলবাবু। সে-ও অধীর আগ্রহ নিয়ে তার অনুষ্ঠান শুনছিল। ওকে সামনে দেখে বলে কাজলবাবু।

—অপূর্ব গেয়েছো সাবিত্রী। জানতাম তুমি ভালো গাইবে, কিন্তু এতো ভালো গাইবে তা ভাবি নি। কন্‌গ্রাচুলেশনস্।

সাবিত্রী ওর দিকে চেয়ে থাকে। ওই কৃতিত্বের সে-ও যেন শরিকান। হঠাৎ কি ভেবে কাজলকে প্রণাম করতে অবাক হয় কাজলবাবু।

—এ্যাই, এ্যাই, আরে—

ওর হাত ধরে কাজলবাবু তুলল সাবিত্রীকে।

সাবিত্রীর সারা দেহ কাঁপছে ওই ছোঁয়ায়। হারানো দিনের সেই ছবিগুলো ভেসে আসে সাবিত্রীর চোখের সামনে।

কাজল দেখছে সাবিত্রীকে। ওর সারা দেহের অনুরণন কাজলের সারা মনে কি আবেশ এনেছে। কাজল সাবিত্রীকে প্রথম দিন ওই স্কুলের সামান্য কাজ করতে দেখে অবাক হয়েছিল। দেখেছিল সাবিত্রীর মুখে-চোখে বেদনার বিবর্ণতাকে। সাবিত্রীর গান গাইবার গলা ছিল, সেই দিনের তরুণটি ভাবে নি সাবিত্রী এইভাবে ফুরিয়ে যাবে। তাই ওকে সচেতন করার জন্যই কঠিনভাবে আঘাত করেছিল।

দেখেছিল তাতে কাজ হয়েছে।

একটা ভালো আশ্রয়ও পেয়েছিল সাবিত্রী। নিজেকে গড়ে তোলার সাধনা করেছে। আজ সে এগিয়ে এসেছে এতখানি।

কাজলবাবু ওর খবর রাখেন। সাবিত্রীকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

আজ তার অনেক বাধা, তবু মনে হয় কাজলের সেই প্রথম যৌবনের বহু দুঃখ-কষ্টের দিনে দেখা, চেনা মেয়েটি তার মনের অনেক খানি জুড়ে রয়ে গেছে।

সাবিত্রীর ডাগর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে কি পাবার প্রগাঢ় তৃপ্তিতে। কাজল অবাক হয়।

রাত্রি হয়ে গেছে।

অনুষ্ঠান চলেছে। সাবিত্রী এই সুরের জগতে তার নিজের আসন করে নিয়েছে। তাই মনে হয় কাজলবাবু আজও তাকে ভোলেনি।

—ফিরতে হবে আমাকে। সাবিত্রী জানায়। সুলেখাদি হয়তো জেগে আছে। অনুষ্ঠানের কথাও জানতে চাইবে সে।

কাজলবাবু বলেন।

—আমার প্রোগ্রাম হয়ে যাক। তোমাকে পৌছে দিয়ে যাবো।

সাবিত্রী ওর দিকে চাইল নীরব চাহনিতে। এমনি সান্নিধ্যটুকু পেতে চেয়েছিল তার সারা মন। আজ সাবিত্রীর বোধ হয় কাজলবাবু ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে চলেছে এতদিন। যে কোন কারণেই হোক নিজেকে প্রকাশ করতে চান নি।

অথচ অন্তরালে থেকে সে সাবিত্রীকে এই জগতে এনেছে। তার খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার পথকে মসৃন করে তুলেছে। সাবিত্রীর সারা মন একটি নীরব মাধুর্যে ভরে ওঠে, রঙ্গীন বর্ণময় হয়ে ওঠে তার জগৎ।

কলকাতার বাইরের কোন শহরে ও অনুষ্ঠান। ওরা ফিরছে।

বোধহয় পূর্ণিমার রাত। ঘুম নেমেছে আশপাশের লোকালয়ে। নির্জন পথে মাঝে মাঝেই দু'একটা মালবোঝাই লরী জোরালো আলোর ঝলক তুলে ছুটে যায়। ওই চাঁদের আলোমাখা গাছ-গাছালির বুকে প্রশান্তি নামে। গাছের ঘন পাতার প্রহরা ভেদ করে কোথায় চাঁদের আলোর হিজিবিজি কাটা রেখাগুলো মাড়িয়ে গাড়ি চলেছে। ওপাশের দিগন্তপ্রসারী শস্যরিক্ত ক্ষেতে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে।

—সাবিত্রী!

কাজল ওকে ডাকছে।

কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব জাগে সাবিত্রীর সারা দেহে-মনে। ওই নিবিড় শান্তির অতলে কাজলের ডাকটা সাবিত্রীকে হারানো অতীতের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

সাবিত্রীর নিঃসঙ্গ মন যেন একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে চায়।

কাজল বলে।

—জানতাম তোমাকে একদিন আমার কাছে পাবো সাবিত্রী। সেদিনের সেই পরিচয় এমনি করে হারিয়ে যাবে না।

সাবিত্রী ওকে দেখছে। বিচিত্র বোধ হয় ওকে।

কাজলের কথায় সাবিত্রী চমকে ওঠে। তার শূন্য জীবনে একদিন কাজল এসেছিল ঝড়ো হাওয়ার মত। কিন্তু সেটা যেন ক্ষণিকের জন্যই। আজ সেই মুহূর্তগুলোর সুররেশ নিঃসঙ্গ সাবিত্রীকে উতলা করে তোলে।

কাজলের হাতখানা ওর হাতে।

এমনি স্পর্শ তার আগেও পেয়েছে। দু'জনের মাঝে দু'জনকে তারা খুঁজে পেতে চেয়েছে। আজও চলেছে সেই ব্যাকুল অন্বেষণ।

গাড়িটা চাঁদের আলোর সীমানা ছাড়িয়ে কলকাতার কাছে এসে গেছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে—ওরা ফিরে এসেছে আবার শহরের পরিবেশে।

কাজল বলে—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম!

অর্থাৎ সময়টা কোন্‌দিকে কেটে গেছে তার খবর রাখে না তারা।

সাবিত্রীও ওই কথাই ভাবছে। এই সময়টুকু কোন্‌দিকে কেটে গেছে তার খেয়াল নেই। সাবিত্রীর জীবনে এ যেন কোন অমৃত সঞ্চয়, তার ব্যর্থ রিক্ত জীবনে আবার সব পাওয়ার আশ্বাস জাগে।

কাজল বলে—আবার দেখা হবে সাবিত্রী।

সাবিত্রী হাসল একটু। কাজলের মনের সেই নীরব যন্ত্রণাকে সেও দেখেছে। সাবিত্রী বলে।

—আজ তো আর পয়সার ভাবনা নেই তোমার, তবে এভাবে কেন আছো? ঘর বাঁধতে তো পারো?

হাসছে কাজল।

রাস্তার একটু আলোর আভাস পড়েছে ওর মুখে-চোখে। কি যেন মলিন বেদনার আভাস জাগে। কাজল ওর কথাটা শুনেছে। তাই বলে সে।

—ওইটাই কি সব?

সাবিত্রী শোনায়—আগে তো ওই কথাই বলতে। তবে আজ কেন ঘর বাঁধো নি?

কাজল বলে—সেই মনের মানুষকে যে খুঁজছি সাবিত্রী।

—তার সন্ধান এখনও পাও নি? তরলকণ্ঠে কলকলিয়ে ওঠে সাবিত্রী।

কাজল ওকে দেখছে। সেদিনের এঁদো বাড়ির লম্বা মেয়েটার দেহে আজ পূর্ণতার জোয়ার এসেছে। শ্রাবণের নদীর মত ও মাতাল হয়ে উঠেছে। এ যেন অন্য একটি নারী—যাকে কাজল আবার নতুন করে চিনতে চায়, দেখতে চায়।

কাজলের মনের এই ভাবান্তরই একটা বৈচিত্র্যময় নেশার মাদকতা আনে। কাজল বলে ওঠে।

—খুঁজছি। তবে মনে হয় এবার খুঁজে পেতে দেরী হবে না।

—তাই নাকি!

ওরা সুলেখাদের পাড়ায় এসেছে।

গাড়িটা একটু দূরে বড় রাস্তার ধারে থামতে সাবিত্রী অবাক হয়ে শুধোল।

—বাড়িতে যাবে না?

সাবিত্রী সুলেখার বাড়িতেই রয়েছে। কাজল কিন্তু অত দূরে গেল না। বলে—তুমি চলে যাও, ওই তো বাড়ি। লেখা শুধোলে বলবে ট্যাক্সিতে এলাম।

অবাক হয় সাবিত্রী ওর কথায়।

—তুমি যাবে না?

হাসল কাজলবাবু। ওর কথাটা এড়িয়ে গেল। তাই সাবিত্রী একাই এসে বাড়ি ঢুকলো।

বাড়িতে তখনও আলো জ্বলছে। সাবিত্রী উপরে উঠে গিয়ে সুলেখাকে দেখে অবাক হয়। সুলেখা ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সাবিত্রী বলে।

—এখনও জেগে আছো লেখাদি?

সুলেখা জবাব দিল না।

সাবিত্রীকে ও দেখছে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। ওই চাহনিতে সাবিত্রী আজ নতুন কিছুর সন্ধান পায়। সুলেখা কিছু বলল না। সাবিত্রী বলে চলেছে নিজে থেকে।

—সুন্দর অনুষ্ঠান হল। আর লোক সমাগমও তেমনি, দেখে তো বুক কাঁপছিল। কাজলবাবু না থাকলে ওখানে গাইতে সাহস হতো না।

কাজলবাবুর কথায় সুলেখাদি ওর দিকে চাইল। তার মুখে একটু কাঠিন্য ফুটে উঠেছে—সেটা সাবিত্রীর দৃষ্টি এড়ায় না।

সাবিত্রীর ব্যাকুল মন আজ খুশীতে ভরে উঠেছে। সুলেখার চোখে সেটাও ধরা পড়ে।

সাবিত্রীর খুশীভরা জগতে তার সন্ধানের আজ অবকাশ নেই। সে হাল্‌কা খুশীর রঙীন আবেশে ভেসে ভেসে চলছে, হারিয়ে যেতে চায়।

সুলেখার চোখের সামনে ওই জগৎটার ছবি অজানা নয়। মনে হয় তার যেন সব হারিয়ে যাবে আর যাকে সে পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে এনেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল সেই নিঃস্ব পথের মেয়েটা রাজেন্দ্রাণী হয়ে সব কেড়ে নেবে তার।

সাবিত্রী বলে চলেছে।

—কাজলবাবুও গাইলেন সুন্দর। আর অটোগ্রাফ নেবার ভিড় কতো, আচ্ছা লেখাদি কি হবে ও দিয়ে? আমি তো সরে এসেছিলাম ভয়ে। কাজলবাবুকে ওরা খুব শ্রদ্ধা করে দেখলাম।

সুলেখা তা জানে। ওই কাজলকে সে আরও নিবিড় করে চেনে। সেই চেনার মধ্যে মাদকতার প্রকাশ নেই। কাজল শিল্পের জগতে অনেক কিছু পেয়েছে, কিন্তু একদিক থেকে সে নিঃস্ব, সর্বহারা। সেখানে তার সেই নিরাভরণ শূন্যতার বেদনাকে চিনেছে সুলেখা। দু'জনের মনের অতলের সেই জগতের পথে দু'টি মন একত্রে শান্তির আশ্বাস খুঁজছে।

সুলেখার সেই নিভৃত মনোজগতে একটা ঝড় উঠেছে। কালো মেঘখানা সেই আকাশের নীলিমাকে ঘন অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে।

সাবিত্রীর মুখে-চোখে একটা জয়ের ঔজ্জ্বল্য ঝকমকিয়ে ওঠে আর সুলেখার মনে মেঘছায়া নামে। দুটি নারী আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একজন আর একজনকে বঞ্চিত করে অনেক কিছু পেতে চায়। সুলেখা যেন সাবিত্রীকে সহ্য করতে পারে না।

সুলেখা বলে।

—রাত হয়েছে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়োগে সাবিত্রী। বলে ওঠে সাবিত্রী।

—খিদে নেই লেখাদি। ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল প্রচুর। খাবো না কছ্হি, কাজলদাই ছাড়লেন না। দুটো গরম গরম ফ্রাই আর সন্দেশ খেতে হলো। রাতে আর কিছু খাবো না।

ওই সব কথা সে শুনতে চায় না। ভালো লাগে না তার। সুলেখা তবু মনের সেই ঝড়টাকে চেপে বলে।

—শুয়ে পড়োগে। ঠান্ডা লাগিয়ো না।

নিজের ঘরে চলে গেল সুলেখা।

সাবিত্রী চমকে ওঠে ওই কথাটায়। এখন এই জগতে নাম কিনতে কিনতে নিজের দেহটাকেও যেন তার অজানতে আরও মোহময় করে তুলেছে। জামাগুলোর মাপও তার নিটোল পুরুষ্টু দেহের সমতা রেখে তৈরী করানো। দেহের রেখাগুলোকে সোচ্চার করে তুলেছে সে, এতদিন পর সাবিত্রী জেনেছে রূপের হাটেও তার কদর আছে।

আর সেই রূপকে সেও প্রকাশিত করে তোলার চেষ্টা করেছে ইচ্ছে করেই।

সাবিত্রী জেনেছে দেখেছে এই জগতের মানুষগুলোকে। তাকেও সে তাই এমনি মোহময়ী করে তোলে নিজের প্রতিষ্ঠাকে কায়েম করার জন্য। তার কণ্ঠের মাধুর্যের সঙ্গে এই রূপটাকেও মিশিয়ে নিয়ে তার কণ্ঠে দেহ-কামনাব মাতাল সুর তুলতে পেরেছে সে। যেখানে আজকের সুলেখাদি ফুরিয়ে গেছে সেখানে নতুন করে জেগে উঠেছে সাবিত্রী তার বৈভব নিয়ে।

সুলেখাদি ওকে যেন সেই ইঙ্গিতটা করেই চলে গেল কঠিন কণ্ঠে। সাবিত্রী এখন সেটা বুঝতে পারে।

রাত হয়ে গেছে।

সাবিত্রীর ঘুম আসে না। ওর সারা মনে যেন কি কামনার ঝড় উঠেছে। হারানো সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছে সে। ও জানতো তার মনের গহনে ছিল এমনি একটি বুভুক্ষু মন। আজ সে অনেক কিছু পেতে চায়।

বাইরে চাঁদের আলোর তুফান নেমেছে। শান্ত স্তব্ধ রাত্রি। বাগানের রজনীগন্ধা ফুলের তীব্র মদির সুবাস মিশেছে হাসনুহানার সৌরভের সঙ্গে। দমকা হাওয়ায় সুপারী গাছের পাতাগুলো কাঁপছে।

সুলেখার ঘুম আসে নি। আজ সেও চমকে উঠেছে। কাজল যে মনে মনে একটা অন্য নেশার স্বপ্ন দেখে এই কঠিন সত্যটাকে উপলব্ধি করে আজ শিউরে উঠেছে সুলেখা। তার নিজের স্বার্থপর নারীমন তাই কঠিন হয়ে উঠেছে। সচেতন হয়ে ওঠে।

সেদিন সুলেখা বের হয়েছে রেকর্ডিং করতে। কি একটা যন্ত্রণা তার সারা মনে ছড়িয়ে রয়েছে। সে বেদনার উৎসমূল কোথায় তা জানে না সুলেখা, তবু তার অস্তিত্বটাকে অনুভব করে। মনে হয় সুলেখার দিন ফুরিয়ে আসছে, সাবিত্রীও সেটা জেনেছে।

রেকর্ডিং শুরু হয়েছে। সুলেখার মনে হয় সে যেন হেরে যাচ্ছে আজ। গলায় ঠিক সুর বসছে না।

—একটু দরদ দিয়ে গাও লেখা। সঙ্গীত পরিচালক সুশীলবাবুর কাছে সুলেখার মানসিক চাঞ্চল্যটা যেন ধরা পড়ে গেছে। ঠিকমত আজ সুরের জগতে ডুবে যেতে পারছে না সে। নিজের কাছেই বিশ্রী লাগে সুলেখার। তবলচীও হঠাৎ ঠেক খেয়ে যায়। সুলেখার মত শিল্পীর কাছে হঠাৎ এই লয়ের গোলমালটাও মারাত্মক বলে বোধ হয়। সুলেখার সারা মনে একটা ঝড় ওঠে।

আবার শুরু করে সে নতুন করে গাইতে। অন্য সময় যে গান দু'বার টেক্ করলেই ফাইনাল হয়ে যেতো—আজ সেখানে চারবার গাইতে হয়েছে।

সুশীলবাবু বলেন—শরীর খারাপ নাকি?

সুলেখাও লজ্জা বোধ করে। জানাল সে।

—মাথাটা ভয়ানক ধরেছে। ঠিক আছে এবার ফাইনাল টেক্ করুন।

সুলেখা এবার যেন শেষ চেষ্টা করছে।

কোনরকমে গেয়ে বের হয়ে এল। গান রেকর্ডিং হয়েছে। কিন্তু সুলেখার মনে হয় এই যন্ত্রণার মধ্যে তার শিল্পীসত্তা কোথায় হার মানছে। কি নিষ্ফল ব্যর্থতায় গুমরে ওঠে সুলেখার সারা মন।

সুলেখা আজ নিজেই বিস্মিত হয়েছে। তার রেকর্ডিং থাকলে কাজলবাবু আসে, অনেকে তাই নিয়ে আড়ালে নানা মন্তব্য করে তা জানে সুলেখা। ওইসব কথাগুলো শুনতে তার ভাল লাগে।

কাজলবাবু থাকলে সুলেখা নাকি ভালো গায়।

আজ সে কথাটার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুলেখা নিজেও জানে আজ তার রেকডিং ভালো হয় নি, কোনমতে উতরেছে মাত্র।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে সে কাজলকে স্টুজিওতে অনুপস্থিত হতে দেখে। তার আজ কোনো অনুষ্ঠান নেই।

হয়তো শরীর খারাপও হতে পারে তার।

সুলেখা তাই বের হয়েছে ফেরার পথে কাজলবাবুর বাড়ি হয়ে যাবে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

রাস্তার ধারে দেওদার গাছে পাখীগুলো কলরব করছে বাসার সন্ধানে। কাজলও যেন এমনি একটি নিভৃত নীড়ের স্বপ্ন দেখেছিল।

আর পাশে পেয়েছিল আর একজনকে৷ কাজলকে ঘিরে তাই ওর মন সেই নিভৃত স্বপ্নে হারিয়ে গেছে। কাজলও সাড়া দিয়েছে।

কিন্তু ক্রমশ দেখেছে সুলেখা কোথায় যেন একটা নীরব বেদনার হাহাকার জাগে। সাবিত্রীকে পথ থেকে তুলে এনেছিল সে।

কিন্তু সেই মেয়েটি আজ তার খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার জগতের শরিকান হয়েছে, সবচেয়ে ভয় হয় সুলেখার ওই সাবিত্রীকে।

সুলেখার সব যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই আজ তার নারীমন একান্তে একজনকে পেয়ে সব হারাবার দুঃখ ভুলতে চায়।

কাজলের কাছে আজ তার অনেক পাবার স্বপ্ন নিয়ে সুলেখা চলেছে।

পরিচিত অনেকে ওকে দেখে, ওরাও হয়তো অবাক হয়েছে কাজলবাবুকে ওর সঙ্গে না দেখে। কারণ ওরা দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে অভ্যস্ত।

সুলেখা একাই চলেছে চেনা পথ ধরে।

বড় রাস্তা ছাড়িয়ে ঝিলের ধার দিয়ে নতুন রাস্তাটা চলে গেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তারাগুলো জ্বলছে নীরব কামনার অস্তিত্ব নিয়ে। মাঝে মাঝে আসে সুলেখা এখানে। টালিগঞ্জের সবুজ নির্জনে এই বাড়িটাকে ঘিরে তার মনে অনেক স্বপ্নসাধ অনেক কামনার সুর উঠেছে। কত নিভৃত সন্ধ্যায় ইমনের সুরে মেশা কামিনী ফুলের উদগ্র সৌরভের তারা দু'জনে একটি কল্পজগতের গহনে হারিয়ে গেছে।

সুলেখা নিজের হাতে এই বাড়ি-ঘরগুলোকে সাজিয়েছে। এখানে তার ছোঁয়া মাখানো।

মনের অতলে জেগেছে নীরব সুপ্ত একটি কামনা। সুলেখা গুনগুনিয়ে উঠেছে।

কাজল বলে—এ যে দেখছি যাযাবরকে ঘরবাসী করে তুললে লেখা?

সুলেখা ওর দু'চোখের চাহনিতে ছায়াকালো মেঘের ইশারা এনে জানায়।

—কেন? চিরকালই কি যাযাবর হয়ে থাকতে হবে তোমাকে?

কাজল হাসে। হালকা উছল কণ্ঠে জানায় সে।

—বনমরালীর সন্ধান হয়তো পাবে সে, জানো না সেই কবিতাটা?

যাযাবর হাঁস বাসা বেঁধেছিল

বনমালীর প্রেমে

আকাশের বুকে থেমে।

হাসে সুলেখা—থামবে তুমি? এ্যাই?

কাজলের হাতে ওর হাতটা, কাজল ওকে কাছে টেনে নেয়। সুলেখার দু'চোখে কি চকচকে আভাস। ওর নারীমন এমনি একান্তে একজনকে নিয়ে সব ভুলতে চেয়েছে, ঘর বাঁধতে চেয়েছে।

—এ্যাই! কি হচ্ছে? অসভ্য কোথাকার!

নিজেকে ছাড়িয়ে কৌতুকময়ী নারী খিলখিলিয়ে হাসছে। সেই হাসিতে কামনার বর্ণালী। এই স্বপ্ন নিয়েই দিন কেটেছে সুলেখার। সুরে ভরে উঠেছে তার মন।

আজ সেই বাড়িটার সবুজ স্নিগ্ধতার মাঝে হঠাৎ এসে পড়ে থমকে দাঁড়ালো সুলেখা। জানলাটা খোলা, উজ্জ্বল রূপোলী ফ্লোরেসেন্ট আলোর আভা পড়েছে সবুজ গাছগাছালির উপর। জানলার সামনে দেখা যায় দুটো ছায়ামূর্তি, চমকে ওঠে সুলেখা। তার সারা দেহে বিদ্যুতের শিহরন খেলে যায়। থমকে দাঁড়ালো সুলেখা।

হাসির হালকা সুর ঝর্ণার ধারার মত কলকলিয়ে ওঠে ঘরের মধ্যে।

সাবিত্রী আর কাজল দু'জনে ওই হাসির তুফানে যেন ভেসে চলেছে।

সাবিত্রী এসেছিল এখানে একটা ছবির প্লেব্যাক-এর চান্স পেয়েছে। কাজলবাবুই সেই সুযোগ করে দিয়েছে। দু'জনে কোরাসেও গাইতে হবে একটা গান। তারই রিহার্সেল

ছিল। ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেছে হঠাৎ আজই। সুলেখাদি বের হয়ে যাবার পর ফোনটা এসেছিল। সাবিত্রীকে ডাকছে কাজল।

—এখুনিই চলে এসো। একটা ফিল্মে গাইতে হবে।

সাবিত্রী অবাক হয় এখুনিই আসতে হবে?

কাজল জানায়—হ্যাঁ। আজই রিহার্সেল।

সাবিত্রী তাই এসেছিল।

সেদিনের রাত্রির অনুষ্ঠানের স্মৃতি সাবিত্রীর মন থেকে মুছে যায় নি। একটু মিষ্টি সুরের আমেজে মন ভরিয়ে তোলে। সাবিত্রী আজ নতুন করে চিনেছে। তাই কাজলকে বলে—এখনও বদলাও নি তুমি?

কাজল বলে।

—তুমি কিন্তু একেবারে বদলে গেছ। ধাপে ধাপে উপরে উঠতে হলে পিছনের দিনগুলোকে ভুলে যেতে হবে সাবিত্রী, হয়তো স্বার্থপর হতে হবে। নিজেকে কিছু পেতে গেলে আশপাশের অনেককে আঘাতও দিতে হবে। তাই শিল্পীরা হয়তো বেশী স্বার্থপর—বেশী আত্মকেন্দ্রিক জীব।

সাবিত্রী শুনছে ওর কথা গুলো। তার কাছেও সুলেখাদির প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে। তাই বলে।

—সুলেখাদি হয়তো এখানে আসা—এই মেলামেশাটা মোটেই পছন্দ করে না।

হাসে কাজল—ও তো মিডওকার শিল্পী। ওর শিল্পমন যত আঘাত পাবে ততই স্বার্থপর হয়ে উঠবে।

কাজল ওকে কাছে টেনে নেয়।

ওর স্পর্শে সাবিত্রীর সারা মন কি অজানা সুরের নেশায় মেতে ওঠে। অণুপরমাণুতে জাগে কি আলোড়ন।

সাবিত্রী স্বপ্ন দেখছে—ওই স্বপ্নের বর্ণালীর গহনে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে—তলিয়ে যাচ্ছে সে স্বর্ণসন্ধ্যার তারাজ্বলা আঁধারে।

কোথায় যেন একটা প্রচন্ড শব্দে বাজ পড়ল। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে দরজাটা আছড়ে পড়ে। কাজলবাবুও অবাক হয় সামনে কাকে দেখে। অবাক হয় সাবিত্রী।

—তুমি? লেখা?

সুলেখা ঘরে ঢুকই থমকে দাঁড়িয়েছে। সবিত্রী সরে গেছে ওপাশে। কি নিবিড় উত্তেজনায় ওর ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। সুলেখা বলে উত্তেজনা চেপে হিমশীতল স্বরে।

—জানতাম না তাই এসে পড়েছিলাম। চলি।

সাবিত্রী মুখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে যেতে দেখে কাজল অবাক হয়—সেকি? চলে যাচ্ছো। লেখা। দাঁড়াও।

সুলেখার জবাব দেবার সাধ্য নেই। তার চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। কাঁপছে ওর সারা দেহ কি অপরিসীম উত্তেজনায়।

কোনরকমে বের হয়ে এল সুলেখা, ওখানে থাকারও যেন কোন দাবী তার নেই। সাবিত্রী তার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। খ্যাতি নাম প্রতিষ্ঠার জগতেও সে তার সবকিছু ছিনিয়ে নিতে চায়—এমন কি তার মনের গহনের সেই স্বপ্নটাকেও সাবিত্রী কি নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

সুলেখা বের হয়ে এসে গেটের বাইরে থমকে দাঁড়ালো। অবাক হয় সে। সেই ঝড়ের পর যেন বর্ষণ নেমেছে। তার দু'চোখে নেমেছে অশ্রুধারা। নিঃসঙ্গ একটি নারী আজ কাঁদছে সব হারানোর বেদনায়।

কিন্তু সুলেখা এত সহজে হেরে যাবে না। ও জানে তার নিজের পরিচয় এই মানুষটির কাছে। সাবিত্রীকে আর সহ্য করবে না সুলেখা, আজ বুঝেছে সাবিত্রী তাকে চরম আঘাত হানার জন্য তৈরী হয়েছে। সুলেখা জানে এরপর তার কর্তব্য কি।

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। অমৃত টুইশানি সেরে ফিরছে।

রাত্রির কথা মনে পড়ে। বোধহয় রাত্রি এখন কোন হোটেলের বারে বসে কোন রাতের সঙ্গীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে মদ গিলছে। নেশার জোয়ারে ভেসে চলেছে আর তার সঙ্গদানের বিনিময়ে সেই ক্ষণিকের অতিথির বেহিসেবী কিছু টাকা রাত্রির ব্যাগে এসে উঠবে। অমৃত জেনেছে রাত্রির এই গ্লানিময় জীবনের কথা।

টাকা হয়তো সে পায়, কিন্তু জানে অমৃত রাত্রির অন্তরের সেই সব হারানোর কান্নাটাকে। ওর বাবা অসিতবাবুও জানেন না আজ মেয়ে কোথায় নেমেছে। ভাবেন

সোসাইটিতে মিশছে রাত্রি, ওই নোংরা বাহ্যিক প্রকাশগুলোকে আভিজাত্যের অংশ বলেই মেনে নিতে গিয়েও তবু পারেন নি ভদ্রলোক।

অসহায় মানুষটা মাঝে মাঝে কি চরম সর্বনাশের কালো আঁধারটাকে দেখে শিউরে ওঠে। তাই বলেছিল আজ অমৃতকে ওই কথাগুলো কি ব্যাকুল স্বরে।

—কিছু করতে পারো না তুমি রাত্রির জন্য?

ও অনুনয় করেছিল অমৃতকে।

অমৃত জানে না কি সে করতে পারে। তার নিজের কাছে বেঁচে থাকাটা একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। একটা ইনটারভিউ দিয়েছে—মুরুব্বীও একজনকে ধরেছে। যদিও সেই চাকরীটা হয়ে যায় তাতে কোনমতে বাঁচার প্রশ্ন সমাধান হবে, কিন্তু যে জীবনে আজ রাত্রি বন্যার ঢলের মত বয়ে চলেছে সেই প্রাচুর্য তার কোনদিনই আসবে না। রাত্রি অমনি আলেয়ার ইশারাতেই পথ হারাবে এই কি নেশায়।

তবু মনে হয় অমৃতের রাত্রিও বাঁচতে চায়, একটা আশ্রয় একটু ভালোবাসা সে পেতে চায়। নইলে অমৃতের কাছে ওই হাহাকার ফুটে উঠতো না। তার পথ চেয়ে থাকতো না।

অন্ধকার পথ। রাস্তার আলোগুলো নেভানো। লোকচলাচলও নেই। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। একটু আগেই বোধহয় কোনো গোলমাল হয়ে গেছে। থমথমে ভাবটা চোখে পড়ে। বাড়িগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ। এখানে-ওখানে কারা সাবধানে দাঁড়িয়ে আছে, ফিসফাস করে কথা বলছে। অমৃত সতর্ক হয়ে ওঠে।

আশপাশে চেয়ে অমৃত এইবার বুঝতে পারে এই অস্বাভাবিক পরিবেশটার স্বরূপ। একটু তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করছে! সামনে কয়েকজনকে গলির অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসে তার পথ আটকে দাঁড়াতে দেখে থামল। কে বলে—দাঁড়ান মশাই।

ওর মুখে এসে পড়েছে টর্চের একঝলক আলো। ওরা দেখছে তাকে।

অমৃত বুঝতে পেরেছে ওরা নিরস্ত্র নয়। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারে না তাদের। একরকমই মুখ, পরণে ময়লা জামা-প্যান্ট, ওদের চোখে মুখে হিংস্রতার কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। ওরা ঘিরে ফেলেছে অমৃতকে। কারো হাতে রড, কারো হাতে ছোরা; অমৃতের মুখে উলসে ওঠে ওদের টর্চের আলো।

ওই টর্চের আলোয় চোখ ঝলসে গেছে। ওদের মধ্যে থেকে কে বলে—অশোকের দাদা না? ধর ওটাকে।

অমৃত বুঝতে পারে না কি তার অপরাধ। ওদের একজনের হাতে খোলা একটা বড় ছোরা। সে ভারী গলায় শুধোয় অমৃতকে।

—সে শ্লা কোথায়? ঐ অশোক!

অমৃত অশোকের কোনো খবরই জানে না। অনেকদিন সে বাড়ি ছাড়া। অমৃত জবাব দেয়—আমি জানি না। বাড়িতেও আর আসে না সে।

—মিছে কথা। সাতদিনের মধ্যে যদি তার পাত্তা না পাই তোমাকেও ছেড়ে কথা বলবো না।

অমৃত কোন জবাব দিতে পারে না। ছায়ামূর্তির দল অন্ধকারে মিশিয়ে গেছে। কে দূর থেকে হুঙ্কার ছাড়ে।

—চলে যাও এখান থেকে, তবে কথাটা যেন মনে থাকে। সেভেন ডেজ।

অমৃত অন্ধকারেই পা বাড়ালো। ভয়ে সে কাঠ হয়ে গেছে।

অমৃত বাড়িতে এসে দেখে সেখানে যেন থমথমে ভাব। বসন্তবাবু তখনও ফেরেন নি। এখন চাকরী থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায়। সুধাময়ী একাই বসেছিল।

অমৃতকে দেখে বলে—কি হবে বাবা? চারিদিকে গোলমাল চলেছে, উনিও ফেরেন নি। ওরা বাড়িতে এসে শাসিয়ে গেল।

অমৃত মায়ের ভীতচকিত মুখের দিকে চাইল। সুধাময়ীর চোখের সামনে একটু আগেকার সেই দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। মারমুখী একদল ছেলে এসে পাড়ায় হানা দিয়ে তছনছ করে গেছে। এখানের অনেক বাসিন্দা ভাড়াটাদের উপর ওদের রাগ ফেটে পড়েছিল। ওরা খুঁজছে তাদের প্রতিপক্ষকে।

তাদের বাড়িতেও ঢুকেছিল পাইপগান—ছোরা—রড এইসব নিয়ে, শাসিয়ে গেছে সুধাময়ীকে তারা কঠিন স্বরে।

—অশোক এখানে আসে! কোথায় থাকে সে?

সুধাময়ী জানে না তার খবর। ছেলেটা কোথায় গেছে—কেমন আছে তাও জানে না। মায়ের মন এত কিছু সত্ত্বেও ছেলের জন্য চোখের জল ফেলে। সে বলেছিল।

—জানি না বাবা তার কোন খবর।

ওই ছেলের দল তবু বিশ্বাস করে নি। বলে।

—মিথ্যে কথা। আমরা জানি সে কোথায়। যদি ধরে না দেন তাকেও পেলে শেষ করবো। আর বাকীগুলোকেও—সুধাময়ী দেখেছিল অন্ধকারের সেই মানুষগুলোর চোখে-মুখে কি বীভৎস ছায়া মাখানো। তারা কারা তাও জানে না সে। অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছে সুধাময়ী।

অমৃতও শুনেছে তাদের হুঙ্কার। তাকেও ওরা রাস্তায় ধরেছিল। কিন্তু অশোকের কোন খবরই তারা জানে না, বাড়িতেও সে ছিল অবাঞ্ছিত একটি সন্তান একথা তাদের বলেও বোঝাতে পারবে না। তাই ওঁরা এসে এখানে হানা দিয়েছে। পথে ঘাটে ওরা এ বাড়ির মানুষদের ধরে ধরে শাসাচ্ছে। অমৃত ভাবনায় পড়ে। ও জানে না এই হিংসার থেকে মুক্তির পথ কোন্‌খানে। মা যেন ভয়ে কাঁপছে। এ বাড়ির সব তছনছ করে গেছে তারা।

অমৃত বলে—ওরা আমাকেও সেকথা বলেছে মা পথে দাঁড় করিয়ে।

—তাই নাকি? ওই এক ছেলের জন্য আমরা কি জ্বলেপুড়ে মরবো বাবা? ঘরে-বাইরে অশান্তি। সুধাময়ী ভাবনায় পড়ে।

অমৃতের মনে হয় এই অঞ্চলগুলোর সাধারণ মানুষের জীবন বিষিয়ে উঠেছে। এখানে আলো নেই। এ যেন কোন অন্ধকারের অতলে হারিয়ে গেছে সবাই। বাঁচার কোন আশ্বাস নেই।

চাকরী-বাকরী নেই—কোনরকমে তবু একটা আশা নিয়ে ধুঁকছিল হয়তো দিন বদলাবে তাদের। এরা সেই জীবনের টিকে থাকার প্রশ্নটাকেও মানতে চায় না। তাই শেষ করে দেবার ছল খোঁজে।

সুধাময়ী বলে—এখান থেকে চলে যাই বাবা অন্য কোনখানে। এখানে থাকবো কি করে?

অমৃত হাসল—কোথায় যাবে মা? সবখানেই এমনি যন্ত্রণা।

—তবে কি বাঁচার কোন ঠাঁই নেই? বেদনার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুধাময়ী। তার চোখের সামনেও আজ বেঁচে থাকাটাই কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অমৃতের কাছে এই প্রশ্ন নতুন নয়। সে দেখেছে তার চারিদিকে শুধু ধ্বংস আর অবক্ষয়কে। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই হতাশ হয়ে হয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে। সুদীপ্তর কথা মনে পড়ে।

ভালো ছাত্র, কিন্তু কোথাও কোনো সুযোগ পায় নি। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ সুদীপ্ত আত্মহত্যা করেছিল ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের তলায় পড়ে।

রাত্রিকে দেখেছে সুন্দর একটি মেয়ে। সেও বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষকালে ওই আর্বতে ভেসে গেছে কোন আশ্রয় না পেয়ে।

তার দিকে দিকেও এমনি ধূসর বিষণ্ণতার ছায়া। বাড়িটায় অন্ধকার নেমেছে।

বসন্তবাবু তখনও ফেরেন নি। রাস্তায় দু'একটা পুলিশের গাড়ি চলাচল করছে। তখনও এ বাড়ির মানুষগুলোর ভয় কাটে নি। ওরা ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে।

নিতুর মা লতিকার ঘরে কি যেন বলছে ফিসফিসিয়ে। টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কথাগুলো শোনা যায়, ওদের যেন শুনিয়ে শুনিয়েই বলছে নিতুর মা লতিকাকে।

—বাড়িওয়ালাকে বলে ওই পাপগুলোকে তাড়াও বৌমা। না হলে আবার আসবে ওই দলবল। এবার আর রক্ষে রাখবে না।

লতিকা বলে—এতদিন বলি নি। এইবার তাই বলতেই হবে। দূর হয়ে যাক ওরা। মেয়েটা তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে—ছেলেও অমনি গুন্ডা। কি সব গুণের ছেলেমেয়ে? ওদের জন্য এইবার আমাদের মরতে হবে? বুড়োটা কোথায় কি তালে থাকে কে জানে?

সব কথাই শোনা যায়। অমৃত বুঝেছে সকলের চোখের সামনে ওদের পরিচয় আজ ক্লেদাক্ত। দুঃসহ মনে হয় কথাগুলো।

সুধাময়ী, অমৃত চুপ করে ওই কথাগুলো শুনছে। তাদের বলার কিছুই নেই। আজ সব মিশিয়ে গেছে অন্ধকারে।

সুধাময়ী ভাবছে।

ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে তারা। যারা গেছে যাক, এইবার তারাও চলে যাবে। সুধাময়ী চিন্তিত মনে বলে।

—তোর বাবা এখনও ফিরল না?

অমৃতের ভয় হয়। তবু বলে সে।

—একবার দেখে আসবো?

আদিম অন্ধকারে ওরা সবাই হারিয়ে গেছে। সুধাময়ী বলে।

—কোথায় যাবি এ সময়? রাত্রি হলে উনি অফিসের গাড়িতে আসেন। হয়তো কাজে আটকে পড়েছেন। আসবেন।

ওরা জাগর রাত্রির প্রহর গুণছে। তখনও ফেরে নি মানুষটা।

সাবিত্রীও ভাবে নি হঠাৎ এমনি একটা অন্ধকার জমাট দেওয়ালে এসে মাথা ঠেকবে তার। জীবনের পথে পথে এমনি বাধা। সেখানে নীতি বিবেক মনুষ্যত্বের কমনীয়তা এসে বাধা পায়। যে ওই মানবিক বৃত্তিগুলোকে পায়ে দলে পিষে চলার পথ করে নিতে পারে সেইই অনেক কিছু পায়, সাবিত্রী সেই পথ নেবে কি-না তাই ভাবছে। আজ সামনে তার দুটো পথই খোলা আছে।

সে এই ভাঙনের মাঝেও আশাব আলো দেখেছিল। তার সামনে দিনগুলো অনেক উজ্জ্বল আর বর্ণময় হয়ে ওঠে। কাজলকে ফিরে পেয়েছে সে। সাবিত্রীর মনে তাই খুশীর জোয়ার উঠেছিল। হঠাৎ সুলেখাকে কাজলের বাড়িতে দেখে চমকে উঠেছিল সাবিত্রী।

সন্ধ্যার পর সুলেখাদির ওখানে ফিরছে সে। এখন ওই বাড়িতেই থাকে সাবিত্রী। আজ সন্ধ্যায় কাজলবাবুর ঘরে তাকে দেখেছিল সুলেখাদি। সবিত্রী লজ্জায় পড়েছিল খুবই, কিন্তু ক্রমশ সেই ভাবটাকে সহজ করে নিয়েছে মনে মনে। এ যেন তার কাছে একটা গৌরবেরই কথা। সে আজ গানের জগতে নাম করছে—কাজলবাবুর মত শিল্পীর ভালোবাসা পেয়েছে। এতে তার লজ্জার বিন্দুমাত্র কিছু নেই।

বাড়িতে ঢুকে একটু অবাক হয় সাবিত্রী। নিচের ঘরটা অন্ধকার। সুলেখাদির ঘরেও আলো জ্বলে নি। সারা বাড়িটাকে ঘিরে একটা বিবর্ণ শূন্যতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

অন্যদিন সুলেখা'র সুর ওঠে বাড়িতে, আজ সব সুর স্তব্ধ হয়ে গেছে। সাবিত্রী একটু অবাক হয়। সুলেখাদি আজ গানের ক্লাশও নেয় নি। এই পরিবর্তনটা সাবিত্রীর চোখে পড়ে। তাই অবাক হয়েছে সে।

সাবিত্রী বাগান পার হয়ে নিচের অন্ধকার ঘরখানা পার হয়ে কোনমতে ভিতরে এলো। এখানেও আলো জ্বলে নি। সাবিত্রী হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা পেয়ে আলো

জ্বালতেই এই ঝলক আলো আঁধারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদিকে কাকে বসে থাকতে দেখে চাইল সাবিত্রী। সুলেখাদির ভারী দলায় থমকে দাঁড়ালো সাবিত্রী।

—আলো জ্বেলো না।

—সুলেখাদি এখানে বসে আছেন?

সাবিত্রী অবাক হয়। ভিতরের বারান্দায় একটা বাতি জ্বলছে। তারই একফালি আলো এসে পড়েছে সুলেখাদির মুখে। ওর মুখ-চোখ থমথমে। কণ্ঠস্বরও যেন অশ্রুরুদ্ধ।

---সুলেখাদি! চমকে ওঠে সাবিত্রী। ওকে এমনি ভাবে ভেঙে পড়তে কোনদিনই দেখে নি সে। সাবিত্রী কি যেন ভয়ে-ভাবনায় চকিতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কাছে এসে সাবিত্রী ওকে সুধোলো।

---শরীর খারাপ নাকি? সুলেখাদি।

—না, না। সুলেখা ওকে দেখেছে। সাবিত্রী দাঁড়িয়ে আছে। সুলেখাদি বলে ওঠে।

---কথাটা তোমাকে বলবো ভাবছিনাম, আজ সেটা তোমারও জানা দরকার সাবিত্রী।

সাবিত্রী ওর কণ্ঠস্বরে কি যেন বেদনা আর দৃঢ়তার সন্ধান পায়। আর সুলেখাদিকে সে নিজের দিদির মতই দেখে। তার জন্যই। সাবিত্রী আজ এইসব পেয়েছে। নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা টাকাও। দয়া করে সে তাকে পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে প্রাসাদে এনে ঠাঁই দিয়েছিল।

সাবিত্রী অনুমান করেছে যে সুলেখাদি তার এই সৌভাগ্যে খুশী নয়।

কারণ বাইরের লোকজন—রেকডিং কেম্পানীর লোক ওই অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারাও অসেন। তাঁরা সুলেখাদির সামনে তাঁকে না ডেকে সাবিত্রীকেই অনুষ্ঠান করতে ডাকেন।

সাবিত্রী তাদের এড়াতে পারে নি। তারও শিল্পীমন এই আমন্ত্রণগুলোকে মেনে নিয়েছে।

সাবিত্রী জানে সুলেখাদি এগুলো সহ্য করতে পারে না।

এই অতৃপ্তি থেকেই সুলেখাদি তাকে ভুল বুঝেছে, আগেকার সেই সহজ মধুব সম্পর্কটায় ভাঙ্গন ধরেছে।

কাজলবাবুর উপর সাবিত্রীর একটা নীরব দাবী আছে সেটা সাবিত্রী জানে।

আগেকার সেই পরিচয় নিয়েই কাজল এগিয়ে এসেছে তার দিকে, আর তার যোগ্যতার জন্যই অনুষ্ঠানে—আসরে ফিল্মে গান গাইতে পায়।

আজ সুলেখাদি সাবিত্রীকে কাজলবাবুর ওখানে দেখে চমকে উঠেছিল। যে ভাবে বের হয়ে এসেছিল সুলেখাদি সাবিত্রী তাতে অবাক হয়েছে।

সাবিত্রীর কাজলবাবুর কাছে যাওয়াটাও সুলেখাদি পছন্দ করে নি।

আজ সাবিত্রী সুলেখাদিকে যেন সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছে। ওর মত সামান্য মেয়ের এই পথে আসার অধিকার নেই, নাম খ্যাতি অর্থ এমন কি কারো ভালোবাসা পাবারও অধিকার নেই।

সারা জীবন মুখ বুজে সব বঞ্চনা সয়ে কোন মতে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকতেই তারা এসছে।

তাই যেন অভিমানে, কি নীরব যন্ত্রণায় গুমরে ওঠে সাবিত্রীর সারা মন। মানুষ হিসাবে সাবিত্রীকে সব সয়ে বাঁচতে হয়, তবু অকৃতজ্ঞ হতে চায় সে।

সুলেখাদির ঋণের বোঝা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সাবিত্রীর দুচোখ জলে ভরে ওঠে। সে বলে।

—এ আমি চাই নি সুলেখাদি। ওরা আসে—বার বার আমাকেই অনুরোধ করে অনুষ্ঠানে যাবার জন্য। প্লেব্যাক করার জন্য তুমি যদি অমত করো, আমি গানই গাইবো না। যেমন ঝিগিরি করছিলাম, তেমনিই ওই সব কাজ করবো, তবু তোমাকে আঘাত দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা যেন না হয়। শিল্পী হয়ে বাঁচার চেয়ে মানুষের পরিচয়েই আমি বাঁচতে চাই সুলেখাদি। এইটুকু পাবার জন্য আমি বিবেক মনুষ্যত্ব-কৃতজ্ঞতা হারাতে চাই না—চাই না।

সাবিত্রী কি উত্তেজনার আবেগে ভেঙে পড়ে।

ওর কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে। সুলেখা ওকে দেখছে।

আজ দুটি চিরন্তন নারী মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নিজের স্বার্থের লড়াই-এ। একজন অনেক হারিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে—অন্যজন এই সব পাওয়াকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই নিঃস্ব জীবনে ফিরে যেতে চায় তার মনুষ্যত্বের পরিচয় নিয়ে। সব পেয়েও সে এতো কিছুকে ধূলোমুঠোর মতই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

সুলেখা ওর কথায় অবাক হয়। এতদিনের সাধনায় ও সিদ্ধিলাভ করে থেমে যাব তা ভাবতে পারে না সুলেখা।

সাবিত্রী কি অসহায় ক্ষোভে কাঁদছে।

সুলেখা একটু অবাক হয়।

তবু শুধোয় সে।

—কি নিয়ে বেঁচে থাকবে সাবিত্রী?

সাবিত্রী কি ভাবছে। ক'দিন ধরে দেখছে সে একজনকে। কাজলবাবুর ওখানে সে নিজের একটা ঠাঁই পাবার দাবী রাখে।

শিল্পীর এই হাহাকারময় স্বার্থপর জীবন থেকে সরে গিয়ে সে ওই ছন্নছাড়া একক নিঃসঙ্গ মানুষটিকে মেনে নিয়েই তার ঘরের কোণে নিজের স্বপ্ননীড় গড়ে তুলবে। ওই কোলাহলমুখর খ্যাতির জীবন সে চায় না। সাবিত্রী বলে।

—এ সব ছেড়ে একটি মানুষকে নিয়েই ঘর বাঁধবো সুলেখাদি। আমার জন্য গানের এই জগৎ নয়, ছোট্ট একটু ঘর—একটি আপনজনকে নিয়েই আমি খুশী থাকবো।

সুলেখা দেখছে সাবিত্রীকে। ওর চোখেমুখে কি যেন সান্ত্বনা আর পরম পাওয়ার আশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে সুলেখা অবাক হয়।

নিজের মনের কোণেও আজ অমনি ঘরের স্বপ্ন। সুলেখা হয়তো ভাবে যে তারও এইটুকু প্রয়োজন আছে, আর সেও তাই পেয়েছে। তাই জানায়।

—হয়তো ওই ভালো সাবিত্রী।

সুলেখাদি নিজের সেই ভাগ্যের কথাটাও জানাতে দ্বিধা করে না। বলে সে।

—ঠিকই বলেছো সাবিত্রী। তাই আমরাও ঘর বাঁধাবো। সাবিত্রী ওর দিকে চাইল।

সুলেখা বলে চলেছে।

—তোমাকে কথাটা বলি নি সাবিত্রী, আমরা বিয়ে করেছি। কাজলবাবু আর আমি। রেজেষ্ট্রী হয়ে গেছে। ভাবছি এইবার—

চমকে ওঠে সাবিত্রী।

তার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বোধ হয়। বিবর্ণ রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে ওর মুখ।

তার সব স্বপ্ন একটু আশ্বাস সবকিছু নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। আজও সুলেখাদিই বিজয়ীর মত তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আর হার মেনেছে—হারিয়ে গেছে সাবিত্রী।

অন্ধকারে কোথায় আকাশ—বাতাস কাঁপিয়ে যেন বাজ পড়েছে। হঠাৎ একটা আলোর দীপ্তি সাবিত্রীর চোখ ধাঁধিয়ে আবার হারিয়ে গেল চিরন্তন অতল তমসার মাঝে।

—সুলেখাদি! সাবিত্রী অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে।

সুলেখা বলে চলেছে—কাজলবাবু বোধহয় বলরেন কথাটা তোমাকেও।

ওসব শোনার শক্তি তার নেই। সাবিত্রী দু'হাত দিয়ে একটা সোফার হাতল ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। কাজলবাবু এসব কথাও জানায় নি তাকে।

কাঁপছে তার সারাদেহ, পায়ের নীচে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। তার সব আশা-আশ্বাস হারিয়ে গেল। এতদিন সে কোন আলেয়ার আলোর ইশারায় ফিরেছে বন্ধুর পথে, যেখানে কোনো আলো নেই—আছে শুধু আদিম অন্ধকার। এই অন্ধকারে সে আলোর স্বপ্ন দেখেছিল।

এখানের সবকিছু আজ মিথ্যা হয়ে গেছে! ওদের কাছে অনেক পাবার আশা যা করেছিল, তা নিমেষেই অর্থহীন শূন্যতায় পরিণত হয়েছে। সব সুর তার আর্তনাদে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সুলেখার ছায়ামূর্তিটা গরবিনী-বিজয়িনীর ভঙ্গীতে তার সামনে জমাট বাধা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে, সাবিত্রীর সব পাওয়া সেখানের প্রচন্ড আঘাতে কাচের ফানুসের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। সাবিত্রী কি অসহ্য বেদনায় বিবর্ণ হয়ে সরে আসছে।

—সাবিত্রী! সুলেখা ডাকছে ওকে। কিন্তু সাবিত্রী দাঁড়ালো না। ওই অন্ধকারেই সে বের হয়ে পড়েছে। ওই বাড়িটা আজ তার সব কেড়ে নিয়ে আবার পথের ধূলোতেই ঠেলে ফেলেছে। অসহায় ক্লান্ত সর্বহারা একটি মেয়ে শূন্য হাতে সব পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে আবার বের হয়েছে অনিশ্চিতের পথে।

কোথায় যাবে জানে না সাবিত্রী।

লক্ষ্যভ্রষ্টের মত চলেছে সে পথ ধরে। নিজের সামান্য পাওয়ার মোহে সে সুলেখাদির জগতে এসে পড়েছিল। যার কাছে সে সব চেয়ে কৃতজ্ঞ সেই সুলেখাদির এতবড় সর্বনাশ সে করতে পারবে না।

রাতের অন্ধকার পথে পথে থমথমে হয়ে আছে। তেমন লোক চলাচল নেই। সাবিত্রী হঠাৎ একটা গাড়ির হেড লাইট চোখে পড়তে থমকে দাঁড়ালো। জায়গাটা নির্জন। নিজেরও ভয় হয় সাবিত্রীর হঠাৎ কোন্ পথে এসে পড়েছে।

সুলেখাদির ওখান থেকে বের হয়ে সাবিত্রী বাড়ির দিকে আসছিল, কোথাও যাবার ঠাঁই আর নেই। চোখের জল শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে কি হতাশায়। রাত কত জানে না। একলা পথ দিয়ে চলছিল সে। এতক্ষণে খেয়াল হয় দুপাশের আলোগুলো নেভানো। আশেপাশে এখানে বাড়িগুলোও আঁধারে ঢাকা। কারা যেন ওই অন্ধকারে ওৎ পেতে রয়েছে। পথে লোক চলাচল নেই। হঠাৎ গাড়ির সামনে অন্ধকার ভেদ করে একদল কালো ছায়া এসে দাঁড়িয়ে ওই গাড়িটার পথ আটকেছে। ওদের চাপা গর্জন শোনা যায়। গাড়ি থেকে কাকে জোর করে ওরা টেনে নামাচ্ছে, ভয়ে শিউরে উঠেছে সাবিত্রী ওই দৃশ্য দেখে।

বসন্তবাবু অন্য দিনের মত সেদিনও গঙ্গার ধারে গেছেন পটলের জন্য মাছ আনতে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। গঙ্গার ধারে এদিকটায় কেমন নির্জনতা।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ওদিকে গঙ্গার বুকে একটা বিদেশী জাহাজে বাতি জ্বলছে। গাদাবোটগুলো দাঁড়িয়ে আছে

নৌকা থেকে মাঝি নেমে এসে একটা ঝুড়িতে কতকগুলো ইলিশ মাছ তুলে দিতেই গাড়িটা স্টার্ট দিয়েছে।

বসন্তবাবু পিছনের সিটে বসে আছেন। মাছভর্তি ঝুড়িটা পায়ের কাছে নামানো।

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে একটা পুলিশ গাড়ির সাইরেন বেজে উঠতেই ড্রাইবারও গাড়িটার স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে।

উল্কার বেগে ছুটে চলেছে গাড়িটা, বসন্তবাবু চমকে ওঠেন। অন্ধকারে আগুনের ফুল্‌কি দেখা যায় দূরে।

গুলী করছে ওরা! তারা মাছ নিয়ে চলেছে মাত্র। পুলিশের গাড়ি তাদেরকে থামাবার জন্য চেষ্টা করেও পারে নি। তাই টায়ার লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে।

বসন্তবাবু ভয়ে শিউরে উঠে এদিকে মাথা নুইয়ে বলেন।

—গাড়ি থামাও।

ড্রাইভারের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

বসন্তবাবুর কথায় গর্জে ওঠে সে—চুপ করে বসে থাকো বুড়ো ভাম। কি মাল পাচার করছো এতদিন জানো না? পুলিশে ধরতে পারলে হাড় সেঁকে দেবে।

বসন্তবাবু মাছের ঝুড়ির উপরই ছিটকে পড়বে ওই প্রচন্ড গতিবেগে, মাছের গায়ে হাত পড়তে একটু অবাক হয়।

মাছের পেটগুলো কাটা তার মধ্যে রয়েছে সোনার বাট।—অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে বসন্তবাবু।

আজ আর বুঝতে বাকী থাকে না পটল এসব মাছ নিয়ে কি করে। ওই সব বিচিত্র জায়গা থেকে বই-এর প্যাকেটগুলো নিয়ে আসে, তাতে কি দ্রব্য থাকে তাও বুঝতে পেরে শিউরে উঠেছে বসন্তবাবু। হাঁপাচ্ছে।

মনে হয় এইবার পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে, আর পটলও সব দোষ দায়িত্ব তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বেমালুম গা ঢাকা দেবে।

বসন্তবাবুর সারা শরীর ঘামছে।

চোখ বুজে বসে আছেন। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়তে হবে। খবরের কাগজে বের হবে ভূতপূর্ব বিপ্লবী বসন্ত মজুমদারের বর্তমানের এই নোংরা কাহিনী।

এর চেয়ে মরাই ভালো।

মনে হয় এই চলন্ত গাড়ি থেকে দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে পড়বেন পথের উপর, শেষ হয়ে যাক সবকিছু।

কিন্তু তা পারেন না।

গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে এ গলি সে গলি দিয়ে অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে। পুলিশের বড় গাড়ি তাদের আর নাগাল পায় নি।

বসন্তবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন।

ভীত আতঙ্কিত একটি মানুষ ক্রমশ চেতনা ফিরে পায়।

গাড়িটা পিছনের গেট দিয়ে এবাড়ির ওদিকে এসে থেমেছে। বসন্তবাবু নেমে আসেন। তখনও সেই ভয়টা তার মন ছুঁয়ে রয়েছে। আজ সব মোহ তাঁর কেটে গেছে।

পটলও এদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। প্রচুর টাকার মাল আসছে। এদের গাড়ির উপর নজর রাখার জন্য লোকও ছিল আশপাশে। পটল জানে সাবধানের মার নেই।

তাই এভাবে সাবধানে প্রহরা দিয়ে মালপত্র আনে, বসন্তবাবু সেটা জানেন না। ওই অন্য গাড়ির লোকই খবর দেয় যে পুলিশের হাতে পড়েছিল তারা, কোনমতে বেঁচে এসেছে।

তাই পটল ওদের আসতে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়।

মালপত্র নিয়ে যা ওঘরে। সব ঠিক আছে তো?

ড্রাইভার মাথা নাড়ে।

পটল খুশী হয়ে কিছু টাকা ওর দিকে এগিয়ে দিতে লোকটা নিয়ে চলে গেল। পটল বসন্তবাবুর দিকেও কিছু টাকা এগিয়ে দেয়।

—নিন মাষ্টারমশাই!

মাষ্টারমশাই! ওটা এখন বসন্তবাবু ডাকনাম মাত্র। রাম-শ্যাম-এর মতই। নাহলে তাঁর ছাত্র পটল আজ চোরা-চালানদার হয়ে শিক্ষককে এই ভাবে মাল আনার জন্য টাকা দিতে পারতো না।

বসন্তবাবুর কথাটা ভাবতেও কষ্ট হয়। আজ তাই স্পষ্ট সতেজ স্বরে তিনি বলেন।

—ওসব রেখে দাও পটল।

পটল ওঁর কণ্ঠস্বরে অবাক হয়। এ যেন আগেকার দিঘীর পাড়ের সেই বসন্ত স্যারের কথা শুনছে সে।

বসন্তবাবু বলেন—একাজে আর থাকবো না পটল, কাল থেকে আমি ছুটি চাইছি। তোমার উপকারের জন্য ধন্যবাদ। আমাকে এবার নিষ্কৃতি দাও।

পটলও কঠিন হয়ে ওঠে ওঁর কথায়। এতদিন ধরেও তার এই সব কাজ করেছে। সব ঘাঁটিগুলোই চিনেছে। কিছু লোকজনকেও চিনেছে। ওকে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ

নয়। তাছাড়া এতদিন পটল এসব ব্যবসা করছে, আজই পুলিশের হামলা হয়েছে, অর্থাৎ কোন গোপন সূত্রে কোন খবর বের হয়ে গেছে হয়তো।

এসময় বসন্তবাবু চলে যাবার কথাটায় সে অনেকখানি গুরুত্ব দেয়।

বসন্তবাবুর কথায় পটল ওই রাগ ভাবনাগুলোকে চেপে রেখে সহজভাবে হাসবার চেষ্টা করে বলে।

—টাকার দরকার থাকে নিয়ে যান।

বসন্তবাবু আজ সব অভাব আর প্রলোভনকেও জয় করেছেন মুক্তির আশায়। তাই বলেন।

—টাকার দরকার নেই বাবা।

পটল চমকে ওঠে ওঁর কথায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে বুড়োকে। পটলের মনে হয় টাকা দেবার লোক আজ অন্য কেউ জুটেছে। তারই চাপে পড়ে বসন্তবাবু এখান থেকে চলে গিয়ে এইসব গোপন খবর ফাঁস করে দেবে। পটলকে চরম বিপদে ফেলবে ওই বুড়ো।

পটল তবু শোনায়।

—কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি এখানে?

বৃদ্ধ জানায়।

—না। এ কাজ আর পারবো না পটল। বয়স হয়েছে। পটল ওসব কথা বিশ্বাস করে না। ওর মনে হয় বুড়ো এই সব বলে এখান থেকে সরে যেতে চাইছে। পটল বলে।

—ছেড়ে দেবেন চাকরী এক কথায়? ওদিকে ঘর সংসার রয়েছে। ছেলে মেয়েদেরও চাকরী-বাকরী হয় নি। তবু—

বসন্তবাবু বলেন।

—ওদের কথা এইবার ওরা ভাবুকগে, আমি আর পারবো না। তাই নিষ্কৃতি চাইছি পটল।

পটল চুপ করে কি ভাবছে।

বুড়োকে টাকা দিয়েও বাগ মানানো যায় নি। ওদিকে পুলিশের নজর পড়েছে।

সাবধান হতে হবে তাকে। আর বুড়ো বসন্তবাবুর সম্বন্ধে একটা চরম ব্যবস্থাই নিতে হবে হয়তো।

বসন্তবাবু বলেন।

—তাহলে চলি বাবা। তোমার দয়ার কথা ভুলবো না।

পটল মনে মনে জ্বলে উঠেছে ওর ন্যাকামিতে। বুড়ো বসন্তবাবু এখনও এ জগৎকে চেনে নি। এর জন্য কি মূল্য দিতে হবে তা ওর জানা থাকলে এত সহজে এসব কথা বলতেও পারতো না।

পটল তাই বলে।

—যখন থাকবেন না ঠিক করেছেন কি আর বলবো, তবু অনুরোধ করবো মাষ্টারমশাই কথাটা ভেবে দেখুন। মাইনে না হয় একশো টাকা বেশী দেব।

বসন্তবাবু শিউরে ওঠেন।

—না, বাবা। টাকার প্রলোভন দেখিও না পটল।

পটলের মুখের উপরও যেন কেটা থাপ্পড় কসিয়েছে। প৹ল নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির কণ্ঠে বলে।

—ঠিক আছে।

পটল কি ভাবছে। এবার তার চরম ব্যবস্থা নেবার পালা। ওকে জাল কেটে বের হতে দেবে না সে। জানে পটল তার বাঁচার পথ থাকবে না। ওর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, বুড়োকে আরও বেশী টাকার লোভ কেউ দেখিয়েছে। পটল তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ে বলে।

রাত হয়ে গেছে। পথ-ঘাটের অবস্থা ভালো নয়। গাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে আসুক আপনাকে।

বসন্তবাবু কুণ্ঠিত বোধ করেন ওর এই সদয় ব্যবহারে। পথের অবস্থাও ভালো নয়। গোলমাল লেগেই আছে। তাই বাধ্য হয়েই রাজী হতে হয়।

—তাই দাও!

পটলও এই চেয়েছিল। তার অন্ধকারের হাতের ইশারায় অনেক কিছুই ঘটে থাকে। তার জন্য লোকেরও অভাব নেই। খবরটাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, নির্দেশ ও চলে

যায় সেই মত ব্যবস্থা নেবার। সেই পাহারাদার গাড়ির লোকজনও ছিল ওপাশের ঘরে। তাদেরই একজনকে ডেকে পটল ইশারায় কি জানিয়ে দিতে সেও দলবল নিয়ে বের হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে এ সব কাজ করা তাদের অভ্যাস আছে। এতটুকু বুক কাঁপে না তাদের।

বসন্তবাবু বাড়ি ফিরছেন। অন্ধকারে গাড়িটা চলেছে জোরালো হেডলাইট জ্বেলে। পথটা এখানে নির্জন। গাড়ির ভিড় নেই। রেললাইন এর চড়াই ঠেলে গাড়িটাকে উঠতে হয়, দু'পাশে ঘন গাছ গাছালির অন্ধকার আলোর প্রবেশপথ রাখে নি, হঠাৎ এমনি সময় ওই ছায়ামূর্তির দল গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই ব্রেক করেছে ড্রাইভার ওদের কাছে বাধা পেয়ে।

তখুনিই ওরা দরজা খুলে ঠেলে বের করে ফেলে পিছনের সিট থেকে বুড়ো মানুষটাকে। আর্তনাদ করে ওঠেন বসন্তবাবু মেরো না মেরো না বাবা।

আবছা অন্ধকারে ঠাওর হয় না ওই ছায়ামূর্তিদের। ওদের হাতে রয়েছে ধারালো ছোরা একফালি আলোয় ঝক্‌ঝকিয়ে ওঠে। কে গর্জে ওঠে চোপ বে।

বসন্তবাবু আর্তনাদ করে ওঠেন—মেরো না আমাকে, আমি তোমাদের কি করেছি?

ওদিকে সাবিত্রীও বাড়ি ফিরছিল। সাবিত্রী যেন স্বপ্ন দেখছে। আবছা অন্ধকারে সে কিছুই ঠাওর করতে পারে না। কোথায় যেন একটা সাংঘাতিক কান্ড ঘটতে চলেছে। ওই আর্তকণ্ঠস্বর শুনে শিউরে উঠেছে সাবিত্রী। এই কণ্ঠস্বর তার চেনা। সেও চীৎকার করে ওঠে।

—বাবা! বাবা!

সব ভুলে সাবিত্রী এগিয়ে যায়। সাবিত্রী অন্ধকারে ওই আর্তকণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে।

আক্রমণকারীর দল চমকে উঠেছে। কে যেন এগিয়ে আসছে এইদিকে। গাড়ির হেডলাইট নেভানো। অন্ধকারের দৈত্যগুলো মরীয়া হয়ে ওঠে, ওদের হাতে সময় নেই, এখুনিই কাজ শেষ করে সরে পড়তে হবে।

তাই দেরী না করে তারা বসন্তবাবুর উপর চরম আঘাত হানে, ছিটকে পড়ে ওর দেহটা প্রচন্ড নির্মম আঘাতে।

সাবিত্রী এগিয়ে আসছে ও ডাকতে থাকে।

—বাবা!

অন্ধকারে বসন্তবাবু ওই ডাকটা শুনেছেন।

ওই কণ্ঠস্বরে মিশিয়ে আছে তার জীবনের অনেক কোমল স্মৃতি, অনেক স্বপ্নসাধ। সাবিত্রী এগিয়ে আসছে ও যেন তার সামনে এনেছে আশার আলো। ওই আলোর দিকে হাতড়ে হাতড়ে। বসন্তবাবু এগিয়ে যেতে চান। হঠাৎ মনে হয় তার সামনে অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠল, সারা শরীরে একটা দুঃসহ বেদনা।—চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার গাঢ়তার হয়ে ওঠে।

কোথাও কোন স্পন্দন নেই। তারাগুলো ঝাপসা হয়ে হারিয়ে গেল। শূন্যে দু'হাত তুলে আছড়ে পড়লেন বসন্তবাবু। সব আশ্বাস, মুক্তির স্বাদ তমসার অতলে মুছে গেল নিঃশেষে।

—বাবা!

অন্ধকারে এগিয়ে আসছে সাবিত্রী। সামনে দিয়ে ওই লোকগুলো মিলিয়ে গেল—গাড়ীটাও এরই মধ্যে চলে গেছে কোন্ ফাঁকে।

সাবিত্রী অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। অন্ধকারে তারাগুলোর ম্লান আলোয় ঠাওর হয় বসন্তবাবু রাস্তায় পড়ে আছেন।

ব্যাকুল আবেগে সাবিত্রী দু'হাত দিয়ে ওকে নাড়া দিতে গিয়ে চমকে ওঠে, রক্তে জায়গাটা ভিজে গেছে, ওর দু'হাতে তাজা উষ্ণ রক্তের স্পর্শ জাগে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সাবিত্রী। ও ডাকছে, নাড়া দেয় প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটাকে। ওর আর্তনাদ রাতের অন্ধকারে সাড়া তোলে।

সাবিত্রীর খেয়াল নেই, সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

কারা এগিয়ে আসছে, লোকজন হবে বোধহয়। সাবিত্রী স্বপ্নাবিষ্ট চোখে দেখছে ওই দেহটাকে। কি দুঃসহ আর্তনাদে সে ভেঙে পড়ে, কাঁদছে একটি অসহায় মেয়ে। তার চোখের সামনে সব হারানোর দুঃসহ বেদনা গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

দিনের আলোর সাড়া জাগে, এ রাতেরও শেষ হয়ে সকাল আসে। ওই এঁদো বাড়িটার মানুষগুলো স্তব্ধ হয়ে গেছে। এতদিনের সব স্বপ্ন বেঁচে থাকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল বসন্তবাবুর জীবনে।

একদিনের বিপ্লবী একটি সত্তা নিষ্ঠুর আঘাতে এমনিভাবে শেষ হয়ে যাবে ওরা তা ভাবে নি।

অমৃত হাসপাতাল মর্গ থেকে ফিরছে। মনে হয় বাবা অনেক আগেই মারা গেছলেন, এই মৃত্যু তার নতুন নয়। মানসিক মৃত্যুকে সয়েও বেঁচেছিলেন তিনি। আজ সব শেষ হয়ে গেল।

সুধাময়ী এখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, তার সব হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় মানুষটা হয়তো কাজ থেকে ফিরবে আবার।

অমৃত চুপ করে বসে আছে। বাবার মৃত্যুটাকে ভোলে নি সে।

কোনো হিসাবই মেলে নি। সব জমা-খরচের খাতার পাতায় লেখা আছে শুধু খরচেরই আঁকগুলো, জমার ঘর খালিই রয়ে গেছে। বসন্তবাবু আজ তাদের কাছে বিস্মৃতপ্রায় একটি অধ্যায়। সুধাময়ীকে দেখে চেনা যায় না।

শত অভাব দারিদ্র্যের মধ্যেও লাল-পাড় শাড়ি আর পাকা চুলে সিন্দুরের আভা তার মুখে কমনীয় একটি লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রেখেছিল। সেইসব আজ হারিয়ে গেছে। সুধাময়ী স্তব্ধ নির্বাক হারানো একটি দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

সুধাময়ীর সারা মনে আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। ওই লোকটির শত্রু ছিল না। নিরীহ শান্ত মানুষটাকে রাতের অন্ধকারে কারা নিষ্ঠুর ভাবে খুন করে গেল জানে না সে।

তবু মনে পড়ে সেই অন্ধকারে হানাদার ছেলের দলকে।

সাবিত্রীও অন্ধকারে তাদের চিনতে পারে নি। তবু মনে হয় ওই দলেরই কাজ এসব। ওরা শাসিয়ে গেছল বার বার।

আবার হয়তো আসবে। সুধাময়ী তাই বলে অমৃতকে।

—এখান থেকে চলে যেতে পারিস না বাবা? একটা সর্বনাশ ঘটে গেল, একটা ছেলের তো পাত্তাই নেই। তবু এখানে পড়ে থাকবি?

অমৃত ও ভেবেছে কথাটা। এই হত্যাকান্ডের পিছনে আর কি কারণ থাকতে পারে? এ ছাড়া তার জানা নেই।

অমৃত বলে।

—চাকরীটা হয়ে যাক মা, তাই যাবো।

অমৃত তবু এবার এত অন্ধকারের মাঝে একটা আশ্বাস পেয়েছে। ভাগ্যকে সে মানে না, কারণ ওকে বিশ্বাস করেও কোন ফল হয় নি। তবু এটা ঘটে গেছে।

ব্যাঙ্কে সেই ভালো চাকরীর নিয়োগপত্র এসে গেছে। বাবার শেষ কাজ করে সেখানে যোগ দিতে হবে।

একজন স্তব্ধ হয়ে গেছে---সে সাবিত্রী। সুলেখাদির ওখান থেকে সরে এসেছে, গানও স্তব্ধ হয়ে গেছে তার।

বাবার সেই শেষ চীৎকারটা এখনও তার কানে ভাসছে। নিষ্ফল করুণ ব্যর্থ সেই আর্তনাদ। সাবিত্রীর নিজের জীবনের সব কামনার শতদল কি উত্তাপে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সুধাময়ী বলে,---এ ভাবে বসে থাকবি তুই?

সাবিত্রী মায়ের দিকে চাইল বিষণ্ণ চাহনিতে। তার যেন করার কিছুই নেই। সব তার ফুরিয়ে গেছে।

সুধাময়ী বলে।

--তাই বলে ওই নিয়ে বসে থাকলে চলবে? বাঁচতে হবে সাবিত্রী।

সাবিত্রীর কাছে সব পথ যেন অন্ধকারে ঢেকে আসছে। সুরও আর বের হয় না। সব কেমন আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

কাজলবাবু সুলেখাদির সেই গানের জগতের কথা মনে পড়ে।

সাবিত্রী যেন ওখানের হারানো একটি মানুষ।

বৈকাল নামছে।

স্তব্ধ বাড়িটায় আর সুর ওঠে না। কাজল অনেকগুলো বছর পর এখানে আসছে। আশপাশে নতুন বাড়ি উঠেছে। এদোঁ পচা পুকুরগুলোর সংখ্যাও কমে এসেছে।

তবু কেমন একটা থমথমে ভাব জাগে। ট্যাক্সিওয়ালা গলির মধ্যে ঢোকে নি। বড় রাস্তায় তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

এই পথটুকু হেঁটেই এসেছে কাজল।

সাবিত্রীকে সেই বৈকালের পর আর দেখে নি। সাবিত্রী কি একটা বেদনায় অপমানে মুখ লুকিয়ে সরে এসেছে, নিজেকে যেন নির্বাসন দিয়েছে সাবিত্রী।

সুলেখার মনের এই দিকটার পরিচয় পেয়েছে কাজল। সাবিত্রীকে দেখে তাই এড়িয়ে গেছল ওর সামনে, তবুও চেষ্টা করেছে সাবিত্রী যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য।

সাবিত্রী আজ প্রতিষ্ঠা পেয়ে—নাম যশ পেয়েও এভাবে সরে আসবে কাজল এটাকে সহ্য করতে পারে নি।

তারও মনে কোথায় পাপ আর লোভ বাসা বেঁধে ছিল, আজ কাজল তার জন্য অনুতপ্ত। তাই এসেছে সাবিত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে।

ওকে নিজের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

এ বাড়িটা বদলায় নি। বরং আরও জীর্ণ হয়ে গেছে। চুণ পলেস্তারা খসে গেছে।

কড়া নাড়তে সাবিত্রী এসে দরজা খুলে কাজলকে দেখে চমকে ওঠে।

—তুমি!

কাজল ওকে দেখছে। উস্কো-খুস্কো চেহারা। মলিন বিবর্ণ চাহনি। এ-যেন অন্য একটি মেয়ে।

কাজল বলে।

—কি ব্যাপার? শরীর খারাপ নাকি? মাসীমা মেসোমশাই অমৃত ওরা কোথায়?

সুধাময়ী কার গলার স্বর শুনে এসেছে। ও অবাক হয়। কান্না ভিজে স্বরে বলে ওঠে।

—এতদিন পর এলে বাবা? সব যে আমার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুধাময়ী। কাজল মাসীমার ওই থানপরা বিবর্ণ মূর্তির দিকে চেয়ে চমকে উঠেছে। অনেকদিন পর সে সাজানো জগত থেকে কি বেদনার্ত মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

সাবিত্রী আজ অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে ওই কাজলের সামনে। নিজেরই লজ্জা করে—কোথায় সেও অতি বড় কাঙ্গাল হয়ে উঠেছিল।

কাজল বলে।

—দোষ আমারও ছিল সাবিত্রী। একটা সত্যি কথা আমিও ভুলেছিলাম। শিল্পীর নিজের জীবন আর শিল্পীজীবন দুটোর অস্তিত্ব এক নয়।

সাবিত্রীও সেটা জেনেছে।

সে নিজের চাওয়া পাওয়ার হিসাব করতে গিয়েই ভুল করেছিল।

সামান্য অবস্থা থেকে সে উঠেছিল, ওই শিল্পীর সম্মান নিয়েই সুখী হতে পারতো সে।

তা না হয়ে ভালোবেসে স্বার্থপরের মত একটি মানুষকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। আজ সেই ভুলটা বুঝেছে সে।

কাজল বলে।

—এভাবে থেমে যাবে না তুমি, হেরে যাবে না। আজ তোমার নাম হয়েছে। এত প্রোগ্রাম—রেকর্ডিং—এত কাজ এসব ছেড়ে এইভাবে ফুরিয়ে যাবে?

সাবিত্রীও মনে মনে তৈরী হয়েছে। এই পরাজয়কে মেনে নিয়ে ফিরে আসবে না।

তার সুরের জগতে সে নিজের সৃষ্টিকে নিয়েই বেঁচে থাকবে।

সাবিত্রী বলে,—এ ভাবে ফুরিয়ে যেতে চাই না, আমিও বাঁচতে চাই!

কাজল ফিরে গেছে।

সাবিত্রীর বোঝাটা যেন অনেক হাল্‌কা হয়ে যায়। ও বলে মাকে।

—এখান থেকে চলেই যাবো মা অন্য কোন বাড়িতে।

সুধাময়ী খুশী হয়।

—তাই চল মা।

সাবিত্রী ভাবছে তার এক ছাত্রীর বাবার ফ্ল্যাট বাড়ি আছে মনোহরপুকুরের ওদিকে। সেখানেই চলে যাবে।

নিজের কাজে আবার ডুবে যাবে সে।

সাবিত্রী বলে।

—কালই কথাবার্তা বলে আসবো মা। এবাড়ির কাজ-কম্মো চুকিয়ে চলে যাবো ওখানে।

দরজাটা খোলাই ছিল।

বাইরে অন্ধকার নেমেছে। হঠাৎ কার সাবধানী পায়ের শব্দে চমকে ওঠে সুধাময়ী। বারান্দায় আলোটা নেভানো।

তবু অন্ধকারে ওই পায়ের শব্দ মায়ের কান এড়ায় না। সাবিত্রীও ফিরে চাইল। অন্ধকার থেকে ঘরে ঢুকেছে অশোক।

মুখে গালে দাড়ি গোফেঁর জঙ্গল। দুচোখ যেন জ্বলছে ওর। প্যান্টের উপর জামাটা ঝুলছে। একটা হাত ওই জামার নীচে প্যান্টের পকেটে কি একটা বস্তুকে ধরে আছে। দুচোখে বন্য উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি ফুটে ওঠে।

মা এগিয়ে গিয়ে অশোককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। অশোকের ভালো লাগে না এই সব কান্না—অসহায় শোক।

ও মাকে থামাবার চেষ্টা করে।

—চুপ কর মা। কান্নার সময় এ নয়। আমি সব জানি ওরা এবাড়িতে এসে তোমাদের শাসিয়ে গেছে—পথে দাদাকেও ধরেছিল। আর ওই বুড়ো মানুষটাকে কে খুন করিয়েছে তাও জেনেছি।

সাবিত্রী চমকে ওঠে—জানিস তুই?

—হ্যাঁ! অনেক অন্ধকারের মানুষ আজ নিজেদের স্বার্থে এইসব কাজ করাচ্ছে। সব আন্দোলন সব চেষ্টাকে ওরা বার বার ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তারই জবাব ওদের দিতে হবে।

মা ওকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে।

—তুই আর যাসনে বাবা। যে ভাবে হোক দিন আমাদের চলবে। হাসল অশোক। ওই দাড়িভরা মুখখানায় হয়তো বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। ওর কাছে ঘরের কোনো আশ্বাস নেই। মায়ের স্নেহ ভালোবাসা—কারো নিবিড় স্পর্শ এসব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অশোক বলে,—এভাবে বাঁচতে চাই না মা। তাই এই হালটাকে বদলাবার জন্যই আমরা হয়তো ফুরিয়ে যাবো। কে?

অন্ধকারে কে আসছে। নিমেষের মধ্যে অশোক একটা কোণে দাঁড়িয়েছে হাতে ওর ঝকঝকে রিভলবার। সুধাময়ী আর্তনাদ করে ওঠে—অশোক অমৃত আসছে।

—দাদা।

অশোক বদলে যায়। রিভলবারটা পকেটে পুরে দাদার দিকে চাইল বন্য উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি মেলে।

অমৃত ওকে দেখছে। অশোক এগিয়ে আসে।

—ঘাবড়ে গেছিস না রে? আজ এসেছিলাম একটা কথা জানাতে।

অমৃত ওর দিকে চাইল। অশোক যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। কেমন অচেনা মনে হয় ওকে।

অশোক বলে।

—দ্যাট ওল্ড ম্যানকে আজ শ্রদ্ধা করি দাদা, বাবা বলে নয়, সত্যিকার সৎলোক ছিল ও। অনেক টাকার মোহ ছেড়ে বাবা পটলের মুখের উপর দিয়ে বের হয়ে এসেছিল। আর হঠাৎ সেই সত্যিকার মানুষটাকে দেখে চমকে উঠেছিল পটল—তাই তাকেও তার দাম দিয়ে যেতে হল প্রাণ দিয়ে। চলি!

অমৃত ওর দিকে চাইল স্তব্ধ বিস্মিত চাহনি মেলে।

সুধাময়ী বলে।

—চলে যাবি?

—থাকতে তো আসি নি মা। অনেক কাজ বাকি। তাই যেতে হবে। যদি আর না ফিরি দুঃখ করো না। জানবে এভাবে বাঁচতে চাইনি বলেই এই দুনিয়ার নাকটায় একটা টক্কর লাগিয়ে ফৌত হয়ে গেলাম। চলি রে সাবিত্রী। থেমে যাবি না, লড়ে যাবি, বুঝলি?

অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল অশোক। ক্ষণিকের জন্য এবাড়িতে এসে আধমরা মানুষগুলোকে আজ কি প্রাণ প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিয়ে গেল।

সাবিত্রী কি ভাবছে।

তারও করার কিছু আছে। এ জীবনকে সেও কি পূর্ণতায় ভরিয়ে তুলতে পারে। এত সহজে সেও হার মানবে না।

জীবন তবু কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। সেই মানুষটার হারানোর বেদনাকে তারা ভুলেছে। ওই মৃত্যুটার কোন রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয় নি। শহরের অনেক মানুষই এমনি করে প্রাণ হারায়। বসন্তবাবুও তেমনি করেই আর একটি মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়েছেন মাত্র।

নতুন বাড়িতে এসে গোছগাছ করে নিয়েছে ওরা। সুধাময়ী স্তব্ধ চাহনি মেলে পথের দিকে চেয়ে থাকে।

অমৃত সাবিত্রী তবু আবার স্বাভাবিকভাবেই সব ক্ষয়-ক্ষতিকে মেনে নিয়েছে।

রাত নেমেছে।

সাবিত্রী রেওয়াজ করছে। এখানের পরিবেশে এসে সাবিত্রী আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। সুধাময়ীও নিশ্চিন্ত হয়েছে। অভাবের নগ্ন জ্বালা এখানে নেই। অমৃতও চাকরী করছে।

সুধাময়ীর দিন কাটে না একা একা। এখানে তিলজলার সেই পাইকারী বাড়ির লোকজনের মত মেলামেশা নেই। একক এরা—নিঃসঙ্গ।

সাবিত্রী ও গানের ক্লাস—রেকর্ডিং—না হয় অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। টাকা ও আনে সত্যি। তবু সুধাময়ী চেয়েছিল ওরা সুখী হোক।

সাবিত্রীও জানে মায়ের ইচ্ছেটা। কিন্তু সেইই বলে।

—ওসব ভেবো না মা। আমার কাজ নিয়ে বেশ আছি।

সুধাময়ী অবাক হয়—কি জানি মা।

অমৃতকে তাই ধরেছে সাবিত্রী। অমৃত অফিস থেকে ফিরে পড়াশোনা নিয়ে বসে। এবার এম-এ কমার্স দিয়ে দেবে সে। এতদিন ছন্নছাড়ার মত ঘুরেছে এবার তাই বাঁচার চেষ্টা করে। টুইশানির যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছে সে।

সাবিত্রীকে ঢুকতে দেখে চাইল। ভাইবোনের মধ্যে এখন একটা মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সাবিত্রী বলে—কথাটা ভেবে দেখেছিস দাদা? এবার মায়ের দিকটাও দেখ। একা একা সারাদিন থাকে। হাসাল অমৃত—তোর নিজের ব্যাপারটা?

সাবিত্রীর মুখে ফুটে ওঠে একটা নীরব যন্ত্রণা। কাজলের ব্যাপারটা অমৃত সবই জানে। এও জানে সেখানে সাবিত্রী হেরে গেছে।

অমৃত ওকথা বলে চুপ করে ওর দিকে চাইল। নিজেই অপ্রস্তত বোধ করে অমৃত।

সাবিত্রী বলে—ওসব ইতিহাস হয়ে গেছে রে? শিল্পীর জীবনে এই অভিশাপ সত্যি। তাই বলছিলাম তোর সেই রাত্রির এপিসোডটা একটু দ্যাখ না?

অমৃত হাসল।

—ওসব মনে আছে তোর?

সাবিত্রী বলে—এবার তোরও একটা আশা অন্ততঃ পূর্ণ হোক। আমাদের কেউ কি সুখী হবো না দাদা?

সাবিত্রীর কথাগুলো ভাবছে অমৃত।

হারানো সেই সুরটা ম্লান সুরভির মত ভেসে আসে বাতাসে, কি যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

তাই অমৃত ওই দিকেই গিয়েছিল। পার্কের গাছগুলোর দীঘল ছায়া পড়েছে। বৈকালের রোদ হলুদ হয়ে ঘাসে ছিটিয়ে পড়েছে। পুরোনো ফ্ল্যাট বাড়িটায় গিয়ে উঠে ওরপাশের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়ালো অমৃত।

নেমপ্লেটটা খসে পড়েছে। মনে হয় কড়া নাড়তে বের হয়ে আসবে রাত্রি। ওর মিষ্টি মুখে ফুটে উঠবে অভিমানের কালো ছায়া। শুধোবে।

—এতো দিন আসো নি কেন?

অমৃত জবাব দেবে—এবার আসার সময় হয়েছে রাত্রি।

আজ অমৃত বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে। তাই এসেছে রাত্রির কাছে কি স্বপ্নের সার্থকতার আশ্বাস নিয়ে।

আজ অসিতবাবুর কথাটা মনে পড়ে। আজ তাঁকেও সেই আশ্বাস দেবে অমৃত। কড়াটা নাড়ছে। মনে হয় যেন দরজা খুলে বের হয়ে এসেছে রাত্রি।

সে নয়! এসেছে একটি ভদ্রলোক। সাহেবী পোষাক পরা, মুখখানা তোলা হাঁড়ির মত। অমৃতকে দেখে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—কাকে চাই?

অচেনা লোককে দেখে চমকে ওঠে অমৃত। ভদ্রলোককে এখানে দেখে নি। তবু বলে সে।

—অসিতবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করবো। তিনি আছেন?

ভদ্রলোক বলে—অসিতবাবু? মানে এখানের আগেকার ভাড়াটে? সেই বুড়োটা?

—আজ্ঞে। অমৃত ঘাড় নাড়ে। দরজার ওপাশ থেকে যেন এখুনি রাত্রি বের হয়ে আসবে তার গলা শুনে। ভদ্রলোক বলেন শুক্‌নো গলায়।

—সরি। তিনি মাস কয়েক আগেই মারা গেছেন। ওদের আর কেউ এখানে থাকে না। ওরা চলে গেছে, এ বাড়িতে আমি এসেছি এখন।

চমকে ওঠে অমৃত। ও শুধালো।

—রাত্রি! ওর মেয়ে, তিনি কোথায়?

—জানি না।

ভদ্রলোক ওর মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। অমৃত তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওর সারা শরীরে—মনে একটা চাবুকের ঘা পড়েছে। অসহায় সে—মুখ বুজে সেই আঘাতটা সহ্য করে নেমে এল। রাত্রি কোথায় হারিয়ে গেছে।

তবু রাত্রির কথা শুনে মনে পড়ে।

কোথায় সে তা জানে না। মনে হয় এখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন হোটেলে বারে বসে আছে একা পথহারা—সব হারানো একটি মেয়ে। নেশায় সে নিজেকে ভুলতে চায়। তারা হারিয়ে যায়, ঘরের বাঁধন নেই, ভালোবাসা নেই। কোন কক্ষচ্যুত গ্রহের মত মহাশূন্যে তারা জ্বালাময় ব্যর্থ অস্তিত্ব নিয়ে প্রদক্ষিণ করে।

ওর খরচের খাতায় শুধু দাগ পড়ে। এখানে সবাই শুধু হারিয়ে যায়! জীবনের অঙ্কগুলো মেলে না। ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়ে চলেছে ওরা সবাই অমৃত-সাবিত্রী-সুধাময়ী সকলেই। তবু বাঁচতে হয়, বাঁচার অভিনয় করে তারা।

অফিসের কাজে সেদিন অমৃত চৌরঙ্গীপাড়ার নামকরা কোন হোটেলে গেছল। পুরু কার্পেট পাতা পথ, ওদিকে শ্বেতপাথরের ঝকঝকে ওয়েটিং হল। কালো ডানলোপিলোর গদি আঁটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে তাদের কর্মকর্তার জন্য অপেক্ষা করছে, ওপাশে সবুজ ঘাস ঢাকা লনমত, পামগাছগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে প্রাণের

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো অমৃত। রেডিওতে সুর উঠছে—বর্ণময় আনন্দঘন জীবনের সুর।

—অসীম প্রাণের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাঁটায় জীবন দোলে।

সাবিত্রী গাইছে। ওর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে মহান একটি সত্যের রূপময় সুর। বাইরে আশ্বাস ও হারায় নি। তুচ্ছ পাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে কোন মহাজীবনকে যেন স্পর্শ করেছে সে। সেই তৃপ্তির আশ্বাস ওর সুরে সুরে ফুটে ওঠে।

আকাশ ভবা সূর্য তারা
বিশ্ব ভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে—

শুদ্ধ অমৃত রাত্রের আলোজ্বলা মহানগরীর পথে দাঁড়িয়ে আজ এই মুহূর্তে নতুন করে নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছে। অনেক হারিয়ে—অনেক ঠকেও মানুষ বেঁচে আছে। কর্মচঞ্চল জীবনপ্রবাহের অতলের ছন্দধারার মত বেদনার চিরন্তন মালিন্যকে ভুলে সেও বাঁচবে। তারা বেঁচে আছে।

রাত্রি সেই তারার আলোর ইশারা দেখে নি। অমৃত আজকের সব বেদনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোন আলোকরেখার সন্ধান করে।

অমৃত সাবিত্রী ওরা বেঁচে আছে। বাঁচবে সব আঁধারের পারেও। সুরটা কি গভীর তৃপ্তিতে ওর মনকে ভরে তোলে। সাবিত্রী ব্যর্থ হয় নি।

নিবিড় অন্ধকারে চলেছে ওরা সকলেই নিঃসঙ্গ পদাতিকের মত কোন চিরন্তন আলোর সন্ধানে।